"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উত্তরসূরি

সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য

মলয়শঙ্কর

পুজোয় চাই নতুন জুতো
ডলি ০৪
সাইজ ৩-৫
টা. ৭.৯৫
সাইজ ২-৭
টা ১৮.৯৫
লিলিপটে ৫১
সাইজ ৫-৮
টা. ১৬.৯৫
রাখী ০৭
সাইজ ৩-৭
টা. ২৬.৯৫
ব্যালেরিনা ৫৫
সাইজ ৯-১১, ১২-১, ২-৬
টা. ২০.৯৫,
২৩.৯৫, ২৬.৯৫
টপ্পার্স ৫৫
সাইজ ৫-১০
টা. ২১.৯৫
ওরিয়েন্টা ৭৫
সাইজ ২-৭
টা. ১১.৯৫
সুপারস্ট্রাইড ৫৯
সাইজ ৫-১০
টা. ৪৬.৯৫
Bata

একটি শিশুর সোনার থালা
দুটি হলেও আদর।
অধিক মানে অবহেলা
কেবলই চড়চাপড়।

"আমার নয়ন-ভুলোনা এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলো ॥"

—রবীন্দ্রনাথ
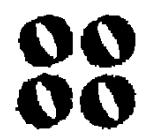
মার্টিন বার্ণ

কলকাতা ০ নিউ দিল্লী ০ বোম্বাই ০ লণ্ডন

এ কথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরনে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ৯,৯০৯টি মৌজায় (১০,৪৪৭টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৬৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাঙলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩ × ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্র্যানস্‌মিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্য্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটিং সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্যে।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট— বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের দশের সার্বিক উন্নতি।
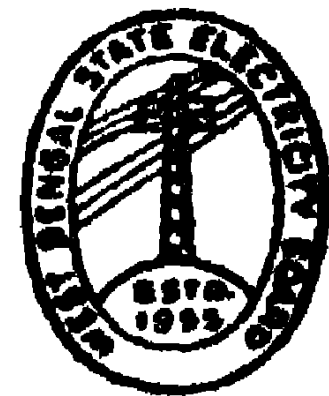
প্রগতির চাবিকাঠি বিদ্যুৎ
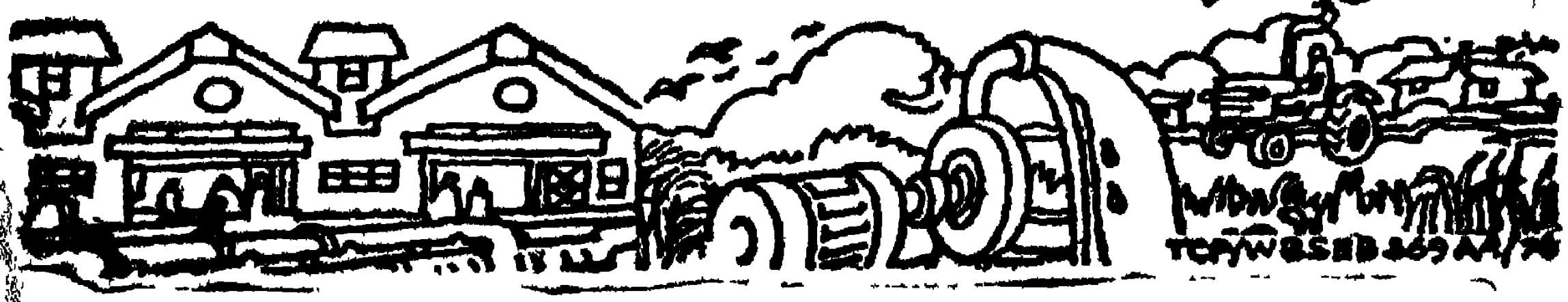
সন্দেশের ইতিকথা

ভারতীয় মিষ্টদ্রব্যের ইতিহাসে সন্দেশ একটি অভাবনীয় পর্যায়। অষ্টাদশ, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও, সন্দেশ বর্তমান আকারে বাংলাদেশে পরিচিত ছিল না। ছানা-জাত যে মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করা হ'ত তা এতই শক্ত ছিল যে তাকে 'সন্দংশ' অর্থাৎ কামড়ে খেতে হ'ত। কিন্তু এই ছানা-জাতীয় মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীতে এক অসাধারণ বিপ্লব ঘটলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে।

এখন সন্দেশ আর কামড়ে খেতে হয় না। মুখে দিলেই গলে যায়,—শুধু নরম পাকই নয়, কড়া পাকও। বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টদ্রব্য তাই সারা ভারতে আজ নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে।

উত্তরসূরি বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৩ ২৩ বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা

*

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

কবিতাবলী

চিত্রকলা

অনুবাদ কবিতা

আলোচনা

প্রচ্ছদ শিল্পী : মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

*

সম্পাদক : অরুণ ভট্টাচার্য । ২বি-৮ কে, সি, ঘোষ রোড কলিকাতা ৫০

এই প্রতীক
কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌—
সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিকাল্‌ ওয়ার্কস্‌-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্‌ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

EIPC-PR-10 BEN

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্ক্স্‌
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল্‌
ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড,
কলিকাতা-১৬

কেশবিন্যাসরতা

কালীঘাটের পট : অসীমকুমার ঘোষ
প্রতিলিপি : মলয়শংকর দাশগুপ্ত

বার্টরাণ্ড রাসেল এবং অজ্ঞাবাদের ধারণা

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

বার্টরাণ্ড রাসেল কী য়ুরোপীয় চিন্তামানসিকতার ক্ষেত্রে শেষ পুরোহিত? কিম্বা কী এমন একজন ব্যক্তি, যিনি য়ুরোপের বর্তমান চিন্তামানসিকতা দিয়ে সঠিক মান নির্ধারণ করতে না-পেরে মনের ভিতর যন্ত্রণা পেয়েছেন? কিম্বা এরকম কোন সন্দেহ পোষণ করেছেন যে-সন্দেহের জন্যে তাঁর মন শেষ পর্যন্ত অন্যদিকে হাত বাড়াতে বাধ্য করেছিলো?

প্রশ্ন না তুলে তাঁর বক্তব্য নিয়েই অগ্রসর হওয়া ভাল। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তাঁর চিন্তা এশিয়ার দিকে হাত বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলো। তাঁর অনুরোধ ছিলো এইরকম: 'I think that, if we are to feel at home in the world after this present war, we shall have to admit Asia to equality in our thoughts, not only politically but culturally.' শব্দগুলো অত্যন্ত শুষ্ক এবং ঋজু। এই শব্দগুলো সামনে রেখেই আমরা রাসেলকে ধরতে চেষ্টা করবো, সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সূত্রগুলো রক্ষা করতে চেষ্টা করবো—যে গুলো রাসেলের চিন্তামানসিকতার ক্ষেত্রেই কাজ করে নি, য়ুরোপকেও চালিত করেছে। যার ভিতর বুদ্ধি একটি বিশেষ শব্দ যার য়ুরোপীয় প্রতিশব্দ—Nous (pure intellect)। রাসেলের ভিতর বুদ্ধি নিয়ে চিন্তাও বলবান ছিলো, প্রবল বিশ্বাস ও আশংকা যেখানে বর্তমান

নৈশ্চিত্যের অভাব সেখানে যন্ত্রণাদায়ক। য়ুরোপীয় চিন্তার সাথে যারা যুক্ত তাঁরা লক্ষ্য করেছেন—সন্দেহ তাঁদের কাছে একটি বিশেষ পদার্থ যার দ্বারা তাড়িত হয়ে তাঁরা একটি বিশেষ সত্যকে জানতে চেয়েছেন। দেকার্তে সেই রকম একজন ব্যক্তি, এমন কি সক্রেটিশও সন্দেহের দ্বারা তাড়িত হয়ে এথেন্সের জ্ঞানীপুরুষদের বুঝতে চেয়েছিলেন। আবার এ-ও অনেকের 'সন্দেহ' নিজেকে জান, এই শব্দদ্বয় গ্রীক-মাটির নিজস্ব সম্পদ নয়, অন্য দেশ থেকে আহরিত। কিন্তু এটা ইতিহাসের বিষয়, যদিও আমরা জানি, ভলতেয়ারের ধারণায় ইতিহাস আলোচনার জন্যে দর্শন একটি প্রবর এবং বর্তমান য়ুরোপের ইতিহাস আলোচনা এই দর্শনকে বুকে স্থান নিয়ে চলতে চেয়েছে—তবুও আমরা সেইদিকে না গিয়ে জ্ঞান নামক শব্দটাকে রক্ষা করে রাসেলকে বুঝতে চেষ্টা করবো। এবং আরও কতগুলো শব্দ ধরতে চেষ্টা করবো, যেগুলো রাসেলের জীবনে বিশেষ উপকরণ ছিলো। সেই রকম শব্দ হচ্ছে—'এ্যারিষ্টক্র্যাসী' 'রেবেল' প্রভৃতি শব্দ। 'সংখ্যা' আর একটি শব্দ, যে শব্দের ভিতর থেকে তিনি আংকিক গঠনকেই দেখেন নি, বিশ্বের মূলতত্ত্বকেও বুঝতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন, বুঝতে পেরেছিলেন কী? উত্তর নিজেই দিয়ে গেছেন নিজের নঞর্থক মানসিকতার দ্বারা:

'Which contained all that I could hope to contribute toward the solution of the problem which had begun to trouble me more than twenty years earlier. The main question (whether we possess anything that can be called knowledge) remained, of course, unanswerd ; but incidentally had been led to the invention of a new method in philosophy and a new branch in mathematics.' এখানেও প্রশ্ন, আংকিক দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে তিনি কোন্ জ্ঞানকর্মের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন যা শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাতই থেকে গেলো? একি কাণ্টের সেই 'দ্রব্য-স্বরূপত্ব' যা কাণ্টের কাছে অজ্ঞাত ছিলো এবং

তিনি তা জ্ঞাত করবার কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন? এর উত্তর তিনি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন নি, আবার অস্পষ্টও রাখেন নি, যে স্পষ্টতা তাঁর ওপরে উধৃত বক্তব্যের ভিতর কিছুটা আছে। কিন্তু এটাই রাসেলের নিজস্ব সমস্যা ছিল, আরও স্পষ্ট করে বললে এটাই বলতে হয়—সমস্যা ছিল বলেই তাঁর চিন্তার দু'টো ধারণা পরস্পর পাশাপাশি থেকে একটি সঙ্গতি চেয়েছিল—যার একটি হলো অভিজ্ঞতা-বাদ যা বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন নিয়ে চলতে চেয়েছে আর একটি কাণ্টের জ্ঞানবাদ, যে জ্ঞানবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের দ্বারা স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এই দুই বৃত্তির সাথে সংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে যখন সন্দেহ আসতো, তখন অস্থির হয়ে উঠতেন। আবার এ-ও বুঝতেন, সংযোগ সূত্রের জন্যে তাঁর প্রধান উপকরণ যে যুক্তিবাদ এ তাঁর মানসিক বিনোদনের একটি অঙ্গ, একে দূরে রাখা যায় না, আবার প্রমাণও মেলে না। তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃতি দিই: 'Aristotle made a fuss about that logic···and therefore in making a fuss about it, it's not that I think it's philosophy—I don't think so.' (১) এই কথা তাঁর বৃদ্ধ বয়সের, এবং 'ফাস' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ—হৈ-চৈ করা-ই কী তাঁর যুক্তিবাদীয় দর্শনের উপকরণ? এই প্রশ্ন কেউ করলেও উত্তর তাঁর কাছে ছিল, যে জন্যে প্রতি আলোচকের কাছেই তিনি একজন বিতর্কমূলক ব্যক্তি। আমরা তাঁকে বিতর্কমূলক না বলে জনমনের উত্তরসাধক বলবো, পার্থক্য—একজন উগ্র আর একজন সরস। যেই সরসতা ব্যাঙ্গাত্মক হাসি নিয়ে প্রোজ্জ্বল, প্রয়োজনানুসারে। যেমন 'না' বলতে পারেন তেমনি 'হ্যাঁ,' বিদগ্ধতাযুক্ত, নাসিকার ওপর উন্নত কপাল। এই উৎক্রমনের জন্যে যৌবনে লেখা 'এ ফ্রি ম্যানস ওয়ারসিপ' প্রবন্ধের ডঃ ফষ্টাসের আলেখ্য নিয়ে রাসেল যে চিত্র আমাদের কাছে উপঢৌকন দিয়েছেন তা স্মরণ করি: 'Had he not given them endless joy? Would it not be more amusing to obtain undeserved praise to be wor-

shipped by beings whom he tortured? He smiled inwardly, and resolved that this great drama should be performed.' আমরা শেষ লাইনটি মনে রাখতে অনুরোধ করছি এবং অনুরোধ করে ডঃ ফস্টাসের পরিবর্তে যদি সেখানে রাসেলকে বসিয়ে দেয়া যায়? উত্তর কি এই, তিনিও কী একজন প্রকৃত অভিনেতার বৃত্তি নিয়ে একটি বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন? উত্তর না দিয়ে, আমরা শুধু তাঁর 'সারডনিক স্মাইল' স্মরণ করব।

২

রাসেল সেই বংশ থেকেই এসেছিলেন, যে বংশ ইংলণ্ডে না, প্রায় সমস্ত য়ুরোপেই কৌলিন্য পেয়েছিল। ঠাকুর্দা জন রাসেল প্রথম আর্ল, তাঁরও পূর্বপুরুষ লর্ড উইলিয়ম রাসেল—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে যাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়েছিল, জন রাসেল প্রধানমন্ত্রী হয়ে রিফর্ম বিলের উদ্গাতা ছিলেন, পিতা লর্ড এ্যাম্বারলি—ষ্টুয়ার্ট মিলের অনুসরক হয়ে মেয়েদের ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রবক্তা—এবং শেষ বংশধর বার্টরাণ্ড! কিন্তু প্রশ্ন, কিসের প্রবর্তক? যদি বলি ভাববাদী দর্শনের এক একনিষ্ঠ পুরোহিত, ভুল কি? এটা আমরা তাঁর কথা দ্বারাই জেনেছি —তিনি দেকার্তের মানসিকতা নিয়ে দিবাস্বপ্নে ভুগতে, কাণ্টের মানসিকতার ওপর অবিশ্বাস থাকলেও উড়িয়ে দিতে পারেন নি, স্পিনোজা-র চারিত্রিক ধর্ম তার কাছে মনে হয়েছিল, 'সুপ্রীম'। ভাববাদী দর্শনে অস্তিত্ব স্বীকার একটি প্রথা, যদি বলা যায় রাসেলও এই প্রথা-র দ্বারা বিভাসিত হয়ে সমস্ত জীবন চালনা করতে চেয়েছেন, এবং তা পুরোপুরি ছদ্মবেশের আড়ালে রক্ষা করা হ'তো? প্রশ্ন না করে ঘটনার সম্মুখীন হওয়া যাক।

উইল ড্যুরাণ্ট তাঁর 'দ্যা ষ্টোরি অফ ফিলসফি' বইতে রাসেল সম্বন্ধে একটি বর্ণনা দিয়েছেন···**'perhaps there was a mystic strain in him always···'** যদিও ড্যুরাণ্ট 'বোধ হয়' শব্দের দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত

কিন্তু প্রকৃত রাসেলকে ধরবার এই শব্দটিই হচ্ছে স্মারক। একজন জার্মান জীবনীকার তঁর যুক্তিবাদের অতিশয়তার জন্যে তাঁকে 'মিষ্টিক র‍্যাশানালিষ্ট' বলে বিশেষিত করেছেন। আমরা একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার মুখোমুখি হই।

র‍্যাসেলের বয়স যখন ছিয়াত্তর লণ্ডনে 'ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদ' বিষয়ের ওপর একটি বিতর্কের অনুষ্ঠান হয়।২ একদিকে যুক্তিবাদী রাসেল আর একদিকে পণ্ডিত ফাদার কপলষ্টন। ফাদার কপল্‌ষ্টন বিতর্কের উদ্বোধন করে প্রথম প্রশ্ন তুললেন: 'I presume that we mean a supreme personal being—distinct from the world and creation of the world. Would you agree—provisionally at least—to accept this statement as the meaning of the term as 'God'.

রাসেলের উত্তর ছিল, তিনি এই সংজ্ঞা স্বীকার করে নিচ্ছেন। এবং কপল্‌ষ্টনের পরবর্তী প্রশ্ন, তাই যদি হয় এই স্বীকৃতির পর এই কথাও বলা যায়—'perhaps you would tell me if your position is that of agnosticism or of atheism. I mean would you say that non-existence can be proved?'

রাসেলের উত্তর: যায় না। আমার পথ অজ্ঞাবাদীর (এ্যাগনষ্টিক)।

উপরের বক্তব্যের বোধ হয় ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই অজ্ঞাবাদের ভিত্তি একদিনে তৈরী হয় নি, প্রাথমিক জীবনে তার ভিতর অনেকগুলো শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো, সেই শব্দগুলোর প্রধান হচ্ছে—'ইনসাইট' 'ইনট্যুইসন' প্রভৃতি শব্দ। এগুলো যদি আপ্তবাক্যের কারক হয়, এই আপ্তবাক্যের ব্যাখ্যা তাঁর মনের ভিতর অনবরত সন্দেহ তৈরী করে একটি দ্বান্দ্বিক প্রবৃত্তি দিয়েছে, সহজ ভাষায় বলা যায় তিনি স্বীকার এবং অস্বীকারের দ্বারা চালিত হয়েছেন। স্বীকারও করতে পারেন নি আবার মানসিক দ্বিধার জন্যে ভ্রান্তিও দূর করতে পারেন নি। এই নিয়ে তাঁর 'মিষ্টিসিজম্ এ্যাণ্ড লজিক' প্রবন্ধে মন্তব্য:

Of the reality or unreality of the mystic's world I know

nothing. I have no wish to deny it, nor even to declare that the insight which reveals it is not a genuine insight'. প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিধাজড়িত মানসিকতা নিয়েই রাসেলের চিন্তাকুলতা। অবিশ্বাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে যখন স্বীকার করতে পারছেন না তখন স্থিরতা অর্জনের জন্যে অন্যদিকে চিন্তা নিক্ষেপ করেছেন, আবার ধীর স্থির থেকে যখন একটি ধারণা করতে পারছেন তখন নিজেই অপার্থিব জগতের মূল্যায়ন দিয়ে স্বীকার করেছেন এইভাবে, এ হচ্ছে তাই যা 'brings strength and fundamental peace which can not be wholly destroyed by strength and apparent failures of temporal life , কিন্তু তাৎপর্য হচ্ছে, এই মানসিকতা তাঁকে যেমন যুক্তিবাদের দিকেও টেনে নিয়ে গিয়েছে তেমনি নিয়ে গিয়েছে যুক্তিবাদের বিরুদ্ধ শব্দ রোমান্টিক মনোভাবের দিকে। এবং এই রোমান্টিক মানসিকতার রাসেলের ব্যাখ্যা—এ হচ্ছে এক ধরণের 'a way of feeling' এবং প্রতিক্ষেত্রেই 'more effected by it than they know'. এবং রাসেল নিজেই যে তার প্রতিভূ হয়তো রাসেল নিজেই তা বোঝেন নি। দুটো উদাহরণের সম্মুখীন হওয়া যাক।

আশী বছর যখন বয়স তখন কি কারণে গল্প লেখার ইচ্ছে হলো। তাঁর গল্প 'The Corsican Adventures of Miss X', 'গো' পত্রিকায় এই বলে প্রকাশিত হলো, যিনি প্রকৃত লেখকের নাম বলতে পারবেন তিনি বিশেষ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হবেন। বলা বাহুল্য, সেই পুরস্কার অবিতরিতই ছিলো। প্রশ্ন, এগুলো কৌতুক? যদিও জানি ইংলণ্ডীয় জনসাধারণ 'রাসেলিয়ান জোক'-এর সাথে বিশেসভাবে পরিচিত, এই রকম 'জোক' বিয়াত্রিস্ ওয়েবও আমাদের উপহার দিয়েছেন। ওয়েব দম্পত্তির আবাসে প্রায়ই শ ও রাসেল উপস্থিত থাকতেন। (হয়তো মানসিক প্রয়োজনের জন্যেই) শীর্ষাসন করে একটি নিশ্চল দণ্ডীর মত মাটির ওপর স্থির, পার্শ্ব রক্ষা করে রাসেল একটি ঘূর্ণায়মান চাকার মত হাতের ওপর ভর রেখে মাটির

ওপর পাক খেয়ে চলেছেন, আর বিয়াত্রিচের স্বামী—সিডনি ওয়েব মুখে স্মিত হাসি নিয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছেন। কিন্তু প্রশ্ন, এই দৃশ্য আমাদের কাছেও উপভোগ্য? উপভোগ্য না বলে বলি ঘটনা, কারণ আমরা জানি যে-কোন ঘটনাই কারকতার সূত্র নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে কারণ হয়। সংস্কৃতে মাত্রা শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, যার দ্বারা অন্যসব জ্ঞাত হওয়া যায়, এও কী সেইরকম? রাসেল সেই রকম করে না ভাবলেও, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রয়োজনের মত—যেটা প্রয়োজন মনে করেছেন সেটা গ্রহণ করেছেন, আর যেটা অপ্রয়োজনীয় তা বর্জন করেছেন। নিজের যুগটাকে নিজস্ব নিয়মে ভাগ করে এইভাবে বলেছেন—এই উনিশ শতক হচ্ছে যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল, সন্তুষ্ট; 'yet the opppsite qualities of our time were possessed by many of the most remarkable men during the epoch of liberal optimism.' এই ধরণের মীমাংসার দ্বারা তিনি এমন সব ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন, অন্যের কাছে তা আপত্তিকর মনে হলেও নিয়মে তাঁরা প্রয়োজন। যেমন বায়রণ। তিনি নিজে জানতেন তাঁর 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' বইতে বায়রণের সংযুক্তি ইংলণ্ডীয় মানসে আপত্তিকর লাগবে। কিন্তু এনেছেন এই কারণে, তাঁর 'এ্যারিষ্টক্র্যাটিক রেবেল'-এর সংজ্ঞায় বায়রণ একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই শব্দের ওপর সঙ্গতি রক্ষা করে নীৎসের ওপর বিশেষণ টেনেছেন—'এ্যারিষ্টক্র্যাটিক হিউম্যানিষ্ট' বলে।৩ এবং নিজের বর্ণনা দিয়েছেন এই বলে: 'a certain anachronistic consistency, reminiscent of the aristocratic rebels of the early nineteenth century.'

শুদ্ধ যুক্তিজ্ঞানকে ধরবার জন্যে যেমন 'ফ্যালাসী' বস্তুটাকে বোঝা প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃত রাসেলকে ধরবার জন্যে এইরকম প্রসঙ্গগুলো বোঝাও প্রয়োজন। যেমন বায়রণ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত একটি মন্তব্য: 'His shyness and friendlessness made him look for comfort in love affairs, but as he was unconsciously

seeking a mother than a mistress'—অদ্ভুত হলেও প্রশ্ন আসে, তিনি কী এই প্রতিবেদন এনেছিলেন প্রুস্ত কিংবা বোদলেয়ারের ঘটনা থেকে? না, নিজেরই কোন অন্তর্বেদনা যা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল এইভাবে জানাতে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের রাসেলের কৈশোরের দিকে তাকাতে হয়—যদিও রাসেল দৈবে বিশ্বাস করতেন না, দৈব না বলে বলি আকস্মিক—যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'চান্স'।

৩

ভলতেয়ারের জন্মের সাথে রাসেলের জন্মের একটি মিল ছিলো, পার্থক্য শুধু এইটুকু—ভলতেয়ারের মুখ দেখে বলা হয়েছিলো কুৎসিত কিন্তু রাসেলের মা নবজাতকের মুখ দেখে যদিও কুৎসিত শব্দ উচ্চারণ করে নি, অসুন্দর শব্দ মনে এসেছিলো।৪ যদিও পরবর্তী দৈহিক গঠন দেখে মার এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু এক এক করে পরবর্তী ঘটনা একটি দুর্দৈব তৈরী করলো। দেড় বছর যখন বয়স বাবা মৃগী রোগে আক্রান্ত হলেন, তিন বছর যখন বয়স (অনেকের মতে চার) দুরারোগ্য ডিপথেরিয়া রোগ সংসারে প্রবেশ করার পর প্রথম বলি হলো ছোট বোন, বড়ভাই জীবনীশক্তির জোরে যদিও রক্ষা পেলো কিন্তু মার মৃত্যু হলো, এবং অসুস্থ মানসিকতার আঘাত সহ্য করতে না পেরে বাবাও গতায়ু হলেন। য়ুরোপীয় রীতি অনুসারে পুরোপুরি অনাথ। কোর্টের বিধানানুসারে লালন-পালনের ভার পড়লো ঠাকুর্দা জন রাসেলের ওপর, যে জন রাসেলের কথা এই প্রবন্ধের গোড়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জন রাসেল তখন পুরোপুরি বৃদ্ধ স্থবির, রাসেলের বয়স যখন ছয় তখন এই বৃদ্ধেরও মৃত্যু হলো এবং রাসেলের কাছে এই ঠাকুরদার স্মৃতি ধূসর পর্দার মত, কেবল এইটুকু মনে আছে—একটি পক্ককেশ বৃদ্ধ হুইলচেয়ারে বাগানে রৌদ্রস্নান নেবার জন্য এসে বসতেন এবং নাতিদ্বয় কাছে এলে হাল্কা রসিকতার

ভাসতেন। কিন্তু ঠাকুরমা—জন রাসেলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—দৈহিক কর্মক্ষমতায় পুরো সমর্থা, বিশ্বাসে প্রোটেষ্টাণ্ট, অনুশাসনে কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠাসম্পন্না—জন রাসেলের মৃত্যুর পর এই মহিলার ওপর পুরোপুরি লালনপালনের ভার পড়লো। ঘটনাগুলো কী তাৎপর্যপূর্ণ? তাৎপর্যপূর্ণ এইজন্যে, বায়রণ সম্বন্ধে ধারণার বীজ এইখানে, যে বীজ উপ্ত হোয়েছিলো একটি বিশ্রী নিঃসঙ্গতায়।

বড় ভাই ফ্রাংক ডানপিটে অশান্ত, কিন্তু বার্টরাণ্ড উল্টো—লাজুক, নম্র ও কল্পনাপ্রিয়। দিন কাটতো বিভিন্ন দিবাস্বপ্নে, যেমন ঘাসের রং কেন এত সবুজ, আকাশ কেন এত নীল—পার্কের কোণে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে পৃথিবীর অন্য গোলার্ধে বোধ হয় পৌছুনো যায়, কিন্তু রাত হলেই তা ভয়ংকর রকমে অসহনীয় মনে হতো। বাপ-মার স্মৃতি মনের ওপর চাপার পর সেই শিশু জানতে চাইতো, তারা কিরকম ছিলো। হয়তো নাতিদের বয়সের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরমা বাপ-মার প্রসঙ্গালোচনায় নিস্পৃহ রইতেন, কিন্তু শিশু মনের অদম্য কৌতূহল ছিলো তা জানার জন্যে। নিজের আত্মজীবনীমূলক লেখায় তা এইভাবে প্রকাশ করছে—রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মনে হতো কি নির্বাক, নিশ্ছিদ্র এবং কঠিন, ওর ওপাশে কি আছে তা জানবার কোন উপায় নেই। কিন্তু বয়স যখন একুশ, বাপ-মার বহু সংবাদ নিয়ে কিছু কাগজপত্র হাতে আসার পর সেই কিশোর উদ্বেল হয়ে প্রকাশ করে ফেলেছিলো, তার বাপ-মাও বিদগ্ধতায় অনুসন্ধিৎসায় কি প্রোজ্জ্বল! পরবর্তীকালে সেই নথিপত্রগুলো একত্র করে 'দ্যা এ্যাম্বারলি পেপারস' নাম দিয়ে বাপ-মার স্মৃতি রক্ষা করেছিলেন।[৫]

সেই জন্যে বলছিলুম এইরকম সংবাদ না জানলে বায়রণ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যার কারণগুলো পেতে অসুবিধাও হতে পারে। যেমন বংশ-ক্রম অনুধাবন না করলে অসুবিধা হতে পারে, রাজনীতি যে সংসারের ভিতর যুক্ত ছিল, তার ভিতর এই ব্যক্তির মধ্যে দার্শনিক প্রবরতা এলো কেন? যেহেতু পিতা মাতা ষ্টুয়ার্ট মিলের অনুসরক ছিলেন? সেও যেমন একটি কারণ তেমনি একটি কারণ এই প্রেমক্রক লজ!

এই প্রেমব্রুক লজই তাঁর জীবনে বহু অনুপান সংগ্রহ করে দিয়েছিল। যেমন ঠাকুরমার অনুশাসন, ধর্মের আচরণ এবং জীবনযাপন পদ্ধতির ভিতর নির্ভেজাল সারল্য। রাসেল বলছেন, ঘড়িধরা ব্যবস্থার মত এই সংসারের গৃহকর্ম চালিত হতো, প্রার্থনার পর প্রাতরাশের পূর্বে নীতি-বিরোধের জন্যে পিয়ানোর ধারে গিয়ে সঙ্গীতের পাঠ নেওয়া, অংক ও দর্শন বর্জনীয় যেহেতু তা নীতিবোধ তৈরী করার পরিপন্থী, অতিথি আপ্যায়নের ঘটনা ছাড়া মদ অপ্রবেশ্য। কোন কোন বিধিনিষেধ নিয়ে রাসেল অস্থিরতা বোধ করতেন, যেমন অংক ও দর্শন—যা তার জন্মগত অধিকার, বিদ্রোহী হবার জন্যে অস্থিরতা বোধ করতো। এই মানসিকতার কথা প্রৌঢ় বয়সে এইভাবে জানাচ্ছেন—'Only virtue was prized, virtue at the expense of intellect, health happiness and mundane good. In the name of intellect I revolted; শব্দগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যদিও রসিকতার আমেজ আছে, তবুও একটু ঝাঁজ আছে—সেই ঝাঁজের ভিতরই 'ভারচ্যু' ও 'ইনটেলেক্ট' শব্দদ্বয় লক্ষ্যণীয়। তাঁর স্মৃতিকাল নামক বইয়ের দ্বারা আরও আমরা জানতে পারি, এই প্রেমব্রুক-লজই তাঁর বুদ্ধিকে তৈরি করবার ব্যবস্থা করেছিল।[৬] দাদুর বিরাট লাইব্রেরী তাঁর জ্ঞান স্পৃহাকে নিবৃত্ত করবার ব্যবস্থা করেছিল, তেমনি ঠাকুরমার অনুশাসন ও বৃত্তি ভবিষ্যতকে দেখবার জন্যে উপকরণও দিয়েছিল। যেমন মদ নিয়ে নিজের মানসিকতা, এ অপ্রয়োজনীয়, ঠাকুরমার দেয়া বাইবেল তাঁর মনকে ঈশ্বর নামক ধারণার সাথে বীজবপন করার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিল, এর সঙ্গে প্রতিবাদী হিসেবে বংশক্রম সূত্র হিসেবে প্রাপ্ত যুক্তিবাদী ধারণা। রাসেলের ওপর বিয়াত্রিস্ ওয়েবের বর্ণনা: 'In morals, he is puritan; in personal habits, almost an asecetic…but intellectually, is audacious—an iconoclast detesting religions and social conventions ..'

শেষের শব্দগুলো এই জন্যেই লক্ষ্যণীয়, কি কারণের জন্যে তাঁর

যুক্তিবাদ নামক অস্ত্রটি নিয়ে অন্যের ওপর এত উৎসাহিত ছিলেন, যদিও এই প্রবন্ধে তাঁর নিজের উদ্ধৃতি দিয়ে আগেই দেখানো হয়েছে— যুক্তিবাদ তাঁর কাছে কখনও জ্ঞানবাদে প্রমা হিসাবে না—তবু ওই শব্দগুলো লক্ষ্যণীয় এই কারণের জন্যে, এগুলোকে লক্ষ্য না করলে রাসেলকে পুরোপুরি বোঝা একটু অসুবিধা হতে পারে। যখন ঈশ্বরের স্বরূপের ধারণা নিয়ে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তখন ষ্টুয়ার্ট মিলের একটি বাক্যই উদ্ধার করেছিল :—

'Who made God ?' এবং তিনি লিখেছেন, 'That very simple sentence showed, as I still think, the fallacy in the argument of the First Cause.' এখানে 'ফ্যালাসী' শব্দটা লক্ষ্যণীয় এই জন্যে অন্যের ফ্যালাসী ধরে তিনি নিজের যুক্তিবাদ তৈরি করতে চেয়েছেন। কিন্তু যেখানে অসম্ভব তিনি নির্বিবাদে তা স্বীকার করে নিয়েছেন। ঘাসের রং কেন সবুজ এ যুক্তির দ্বারা বোঝানো যায় না, যেমন ব্র্যাডলির 'এ্যাপিয়ারেন্স এ্যাণ্ড রিয়েলিটি' নিয়ে বক্তব্য :

'In one sense all experience is experience of the Deity", but in another, since experience equally is in in time, and the Deity is timeless, no experience is the experience of Deity—'as such' pedantry would bid me to add. The gulf between Appearance and Reality is so profound that we have no grounds, so far as I can see, for regarding some experiences as nearer than others to the perfect experience of Reality (৭).

তার অজ্ঞাবাদের কারণটি যেমন এখানে স্পষ্ট তেমনি লক্ষ্যণীয় 'পেডান্ট্রি' নামক শব্দটিও, যে শব্দের ভিতর তাঁর যুক্তিবাদের গোপন সূত্রটি নিহিত, যে সূত্রের ভিতর তাঁর বিদগ্ধতাজনিত আগ্নেয় উত্তাপ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। কিন্তু এই কথাগুলো বলেছিলেন যৌবনে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে তাঁর সন্দেহ নিয়ে পাশ্চাত্য ইতিহাসের বই-কে এইভাবে আরম্ভ করেছেন 'Has the universe any unity or purpose

...Or is he what appears Hamlet?' এই প্রবন্ধ স্মরণ রেখে নিজের দার্শনিক প্রবৃত্তির বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে: 'British philosophy is more detailed and peacemeal than that of continent, when it allows itself some general principle, it sets to work inductively by examining its varions applications.'

এই কারণের জন্যেই গ্রহণ এবং বর্জন নিজের সুবিধানুসারে করে গেছেন। যেজন্যে ওকাম-এর 'ক্ষুরধার' পদ্ধতি তাঁর কাছে একটি প্রকরণ। একটি টেবিল দিয়ে উইল ড্যুরাণ্ট তাঁর দর্শনের ইতিহাস বই-এ রাসেলকে—বেকন-লক-স্পেন্সারের উত্তরস্মৃরি হিসাবে দেখিয়েছেন। বেকনের যুক্তিবাদী জ্ঞান, লকের অভিজ্ঞতাবাদী এবং স্পেন্সারের বিজ্ঞানবাদী দর্শন—এই ত্রিমুখী প্রকল্পের ভিতর যদি রাসেলকে দেখা যায়, রাসেল কী স্পষ্ট? কাণ্ট-এর সীমাবদ্ধতার কথা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিলো, সেজন্যে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অংক হলো এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা 'Not only truth but supreme beauty......sublimely pure, and capable of a stern perfection such as only the greatest art can show.'

এই কথাগুলো প্রকাশ করেছিলেন যৌবনে, যে জন্যে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় এর ভিতর উচ্ছ্বাস ছিলো, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাঁর 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস' বইতে পাইথাগোরাসের প্রসঙ্গের ভিতর এই বক্তব্য আরও স্পষ্ট করলেন। এবং সেই বক্তব্য ছিলো এই রকম: 'Mystical doctrines as to the relation of time to eternity are also reinforced by pure mathematics; so mathematical objects, such as numbers, if real at all, are eternal not in time. Such eternal objects can be conceived as God's thoughts.' এবং এটুকু জানিয়েই খুশী হন নি, তার ভিতর আরও একটু যোগ করলেন: 'Sir James

Jean's belief that He is addicted to God.' উইল ডুরাণ্ট এই জন্যেই তাঁকে আখ্যা দিয়েছিয়লন, এযুগের নয়া পাইথাগোরাস।

৪

যা কাণ্টের কাছে অসাধ্য ছিলো, 'It remains completely unknown to us,' রাসেলের অক্ষমতা কাণ্টের মত নির্বিকার না করে বিকারগ্রস্ত করলো। তিনি দর্শন থেকে স্থান বদল করে অন্যদিকে মুখ ঘোরালেন, রাসেলের ভাষায় সেটা—'পেডাণ্ট্রী' ও 'এ্যারিস্টক্র্যাটিক রেবেল।' কিন্তু উইল ডুরাণ্ট সেটা অন্য রকম অর্থ করে প্রকাশ করেছেন :

There have been two Bertrand Russells : One who died during the war ; and another who rose out of that one's shroud, an almost mystic communist born out of ashes of a Mathematical logician.' যদিও আমরা জানি তিনি কম্যুনিজম্-এর মিষ্টিক সূত্র ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু একটি শব্দ এখানে লক্ষ্যণীয়—সেটা হচ্ছে 'শ্রাউড্, যার বাংলা অর্থ আবরণ। শব্দটি কী তাঁর মানসিক পরিচ্ছদের একটি বিশেষ অঙ্গ? একটি উদাহরণ সামনে রাখা যাক। একসময়ে লণ্ডনে আলোড়ন উঠেছিল, রাসেল ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা এখন অনুপ্রাণিত! এই সংবাদের তাৎপর্যে রাসেল বলে উঠলেন : 'There has been a rumour in recent years to the effect that I am less opposed to religious orthodoxy than I formerly was. This rumour is totally without foundation.(৮)

উপরোক্ত লাইনগুলোর ভিতর যে শব্দটি বিশেষ, সেটা হচ্ছে—'কট্টরবাদ', এই কট্টরবাদীদের বিরুদ্ধেই তাঁর আপত্তি। যেখানেই এই কট্টরবাদী মন দেখেছেন, সেখানেই তিনি বিয়াত্রিস ওয়েবের

ধারণায়, উদ্ধৃত—এবং আমাদের ধারণায় বাইরে উদ্ধৃত হলেও, ভিত তাঁর নিশ্চিতি ছিলো: *'all word that are used in meta* physics are nonesnse, or anything like that which I don't really hold.(৯

এবং এ-ও জানি, বহু জিনিষের ভিতর থেকে এই কথাটাও স্পষ্ট করে বলেছেন: 'I have been much occupied with vast events that have taken place during my life time, I have thought myself an abstract philosopher. এখানে 'এ্যাবষ্ট্রাক্ট' শব্দটিও যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি লক্ষ্যণীয় বহু বিষয়ে পরিক্রমণতার ভিতর দর্শন নিয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি।

কিন্তু এই যুগটাকে চিহ্নিত করতে এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথ রাসেল সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছিলেন, রাসেলের সবই ছিলো কেবল ষষ্ঠেন্দ্রিয় বাদে। আমরা, ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের আলোচনায় না গিয়ে, নিজের পরিণতি নিয়ে যে মন্তব্যগুলো ব্যবহার করেছিলেন, সেই মন্তব্যের কয়েকটি উদ্ধার করবো। নিজের অবিচিউরি লিখতে গিয়ে নিজের মূর্তি তুলে ধরবার জন্যে তিনি তা এইভাবে জানাচ্ছেন: 'He was the last survivor of a dead epoch.' এইটুকু জানাবার আগে তিনি এও যোগ করেছিলেন, রেষ্টোরেশনের পর মিল্টন যেভাবে নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনিও সেভাবে নিঃসঙ্গ! কথাগুলো কী লক্ষ্যণীয়, এবং এই কথাগুলোর সঙ্গে কী আমরা সেই কথাগুলো স্মরণ করবো যা তিনি য়ুরোপের দুটো যুদ্ধ দেখার পর ব্যবহার করেছিলেন? তা না করে বরঞ্চ নব্বই বছর বয়সে যখন আনবিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেলে যাবার পর যে কথাগুলো বলেছিলেন সেই কথাগুলো স্মরণ করি:

'In this topsy turvy world, I shall not be surprised if my last years are spent in a lunatic asylum—where I shall enjoy the company of all who are capable of feelings of humanity.' দার্স্তীয় ধরণের এই কথাগুলো পৃথিবীর

পরিণতি দেখে রসিকতার মেজাজ নিয়েই বলেছিলেন, যেজন্যে 'এনজয়' শব্দটা এখানে দ্যোতনাসূচক এবং দান্তে সম্বন্ধে রাসেলের বিশ্লেষণ ? 'a great innovator somewhat behind the times'—এবং এই বিশ্লেষণের মেজাজ নিয়ে রাসেলও কি পরিক্রমণের আশা পোষণ করেছিলেন ? উত্তরের জন্যে না গিয়ে তিনি ডঃ ফষ্টাস্‌কে নিয়ে যে সংলাপ টেনেছিলেন সেটাই স্মরণ করি : 'yes it was a good play ; I will have it performed again.' †

† প্রবন্ধের ভিতর যে বইগুলোর কথা স্মরণ করা হয়েছে, এছাড়াও আমি নিম্নলিখিত বইগুলোর সাহায্য নিয়েছি :

ক। Portraits from Memory—Bertrand Russell.

খ। Makers of the World—Louis Untermeyer

গ। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড)—তারকচন্দ্র রায়

পাদটীকা :

(১) 'Why I am not a Christian' বই-এ 'Existence of God' বিতর্কের সমাপক অংশ স্মর্তব্য।

(২) 'Why I am not a Christian' বই-এর 'Existence of God'.

(৩) ভয় থেকে ধর্মের উৎপত্তি, নীৎসে এই সৎ কথাটা জানতে পেরেছেন বলে রাসেল রসিকতার স্বরে প্রতিলিপি রাখছেন : 'I am afraid my neighbour may injure me, and so I assure him that I love him. 'লাভ' শব্দটা কী এখানে ক্রীড়ার্থক ? এই ক্রীড়ার্থক ব্যঞ্জনার ব্যবহার রাসেলের রচনায় প্রচুর।

(৪) যুক্তিবাদ, ব্যঙ্গ, পরিহাসনিপুণতায় যে ভলতেয়ার অষ্টাদশ শতকের এক বিশেষ পুরুষ ; সেই ভলতেয়ার তাঁর 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' বই-এ আসে নি। কারণ, প্রকৃতির পরিহাস? হয়তো ভলতেয়ার জীবিত থাকলে নিজের কথা উদ্ধৃত করে আবার বলতেন : 'Believe as I do, or I shall assassinate you.'

(৫) Herbert Gottschalk-এর 'Bertrand Russell : A life' বই।

(৬) Portraits from Memory : বার্টাণ্ড রাসেল।

(৭) 'Why I am not a Christian' বই-তে 'Seems, Madam? Nay it is' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৮) ও (৯) ঐ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-লিখিত অপ্রকাশিত কুলপঞ্জিকা

বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'-এর সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই আত্ম-চরিত রচনার উপাদান হিসেবে ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিঠিপত্র সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি গৃহীত হয়েছে। তবে আত্মচরিতের দ্বিতীয়ার্ধ রচনাকালে তিনি নিজের ডায়েরীগুলি থেকেই সর্বাধিক সাহায্য পেয়েছিলেন, অনুমান করি। জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী বলেছেন, তাঁর বাবা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেন। এই সব ডায়েরীর কিছু কিছু প্রকাশিত, অনেকগুলি আবার অপ্রকাশিত। এই ডায়েরীগুলি ব্যতীত তাঁর স্বহস্ত-লিখিত একটি কুলপঞ্জিকাও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। অদ্যাবধি এটি অপ্রকাশিত। যেহেতু এটি কুলপঞ্জিকা, সেহেতু এর বিবরণ ব্যক্তিগত এবং বংশগত। তবে 'আত্মচরিত'-এর সূচনার সঙ্গে এই কুলপঞ্জিকার আদ্যাংশের আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। শিবনাথ 'আত্মচরিত' লিখতে আরম্ভ করেন অনুমান ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। অপ্রকাশিত ডায়েরী এমনই তথ্য সরবরাহ করছে। আর এই কুলপঞ্জিকার সূচনা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২৯শে নভেম্বর তারিখে। সেদিক থেকে এটিকে সহজেই আত্মচরিতের খসড়া রচনার উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এখানেই এর সাহিত্যমূল্য। 'আত্মচরিত' -এ অবশ্য ৫ই জুন ১৯০৮ তারিখ পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত। কুল-পঞ্জিকায় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখার শেষ তারিখ ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্ভবতঃ 'আত্মচরিত' প্রকাশের উদ্যোগের কারণে এর পর আর লেখেন নি।

সূচনায় বলেছি, অদ্যাবধি এটি অপ্রকাশিত। কিছু অনৃতবাদিতা আছে এই উক্তিতে। এখানে প্রদত্ত বংশলতিকাটি পূর্বে আরও দু'জন ব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। হেমলতা দেবী করেছেন তাঁর 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনচরিত' (১৯২০) নামক গ্রন্থে এবং সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ব্যবহার করেছেন শিবনাথের 'আত্মচরিত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২০) সম্পাদনাকালে। বর্তমান সম্পাদকও তাঁর 'সাহিত্য সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী' গ্রন্থে একে ব্যবহার করেছেন। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সম্পাদনাকালে কুলপঞ্জিকার আরও একটি অংশ—যেখানে শিবনাথের বড় ও ছোট পিসিমা এবং পিতৃব্য রামতারণের উল্লেখ আছে—সেটি পাদটীকায় হুবহু উল্লেখ করেছেন। হেমলতা দেবী তাঁর উক্ত জীবনীগ্রন্থে অন্যান্য অংশও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করেছিলেন বলে আমার অনুমান, অন্ততঃ বংশপরিচয় পরিচ্ছেদে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ এ জানুয়ারি। মৃত্যু হয় ৩১ এ সেপ্টেম্বর ১৯১৯-এ। পিতৃভূমি চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর গ্রাম—শিয়ালদহ-লক্ষ্মীকান্তপুর রেললাইনের জয়নগর-মজিলপুর ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়। জন্মস্থান অবশ্য মাতুলালয় চাঙড়িপোতায়—ঐ একই রেলপথের বর্তমান সুভাষনগর ষ্টেশনের সন্নিকটবর্তী। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে সংস্কৃত বিষয়ে এম, এ, ও শাস্ত্রী উপাধি পান। সূচনায় কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে প্রধানতঃ এঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (১৮৭৮)। আজীবন এরই সেবায় ছিলেন নিরত। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য প্রভৃতিরও তিনি একজন সার্থক রচয়িতা। বর্তমান কুলপঞ্জিকায় আমরা তাঁর একটি অন্তরঙ্গ ও স্নেহময় পারিবারিক পরিচয় পাই। কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের কারও কারও পরিচয় পরিশেষে প্রদত্ত হল। এই কুলপঞ্জিকাটি আমি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে পেয়েছি। এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এঁর

াম পাঠক কুলপঞ্জিকার মধ্যে কয়েকবারই পাবেন। বস্তুতঃ এঁকে
কন্দ্র করেই কুলপঞ্জিকাটি আরব্ধ ও লিখিত।

পাঠক আরও লক্ষ্য করবেন, কুলপঞ্জিকাটি তিনটি দিনের বিবরণে
রিপূর্ণ—২৯. ১১. ১৯০২ , ২৩. ৮. ১৯০৩ এবং ২৭. ১১. ১৯০৬
।রিখের। অবশ্য শেষ দিনের বিবরণ ২৭ এ নভেম্বর ১৯০৬ তারিখের
লেও শাস্ত্রী মহাশয় এটি সমাপ্ত করেছেন ১লা ডিসেম্বর ১৯০৬
।রিখে—স্বাক্ষরের শেষে এই তারিখই লিপিবদ্ধ। কুলপঞ্জিকার মধ্যে
৩ আগষ্টের বিবরণের শেষে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বাক্ষরের বামপার্শ্বে
। বিবরণটুকু আছে, তা অবন্তী দেবীর লিখিত। সে কারণে মূল
কায় সেটি দিলাম। এই বিবরণের জন্য ১১ নং পাদটীকা লক্ষ্য
রতে অনুরোধ করছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার শেষে পরিবারের
ন্যান্য ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সে বিবরণ এখানে দিলাম
। অপ্রাসঙ্গিক হবে ভেবে।

যে খাতায় কুলপঞ্জিকাটি লিখিত সেটি শিবনাথের আদেশ মত
কনে এনেছিলেন পুত্র প্রিয়নাথ। এখানে তার উল্লেখ আছে।
াতাটি লাইনটানা লম্বা রেজিষ্টার খাতার মতো—পরিমাপ—সাড়ে
ইঞ্চি × বারো ইঞ্চি। বাঁধানো। এবারে কুলপঞ্জিকার অনুলিপ
র পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হল।

প্রথম পৃষ্ঠা ॥

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং

কুল-পঞ্জিকা।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ ২৯ নভেম্বর। শনিবার হইতে। আরব্ধ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠা ॥ [কিছু লেখা নেই।]

বংশলতিকা

৪র্থ পৃষ্ঠা ॥ বাৎস গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলোৎপন্ন

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা
রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
রামেশ্বর বা খাউ বিদ্যালঙ্কার
রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
সীতারাম ভট্টাচার্য্য
রাধানাথ ভট্টাচার্য্য
রামজয় ন্যায়ালঙ্কার
রামকুমার ভট্টাচার্য্য
শ্রীহরানন্দ বিদ্যাসাগর
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী
শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীরেবতীনাথ ও অমরনাথ ভট্টাচার্য্য

৫ম পৃষ্ঠা ॥ বালিগঞ্জ ২৯ নভেম্বর ১৯০২। আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন রাও মহাশয় গত পরশু ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার তারে সংবাদ দিয়াছেন যে সেই দিন মধ্যাহ্ন ১২টা ৫৮ মিনিটের সময় আমার পুত্র প্রিয়নাথের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। বধূমাতা

[শ্রী]মতী অবন্তী দেবী প্রসব হইবার জন্য পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, সেখানে নিরাপদে পুত্রের মুখ দর্শন করিয়াছেন। আমার আদেশক্রমে প্রিয়নাথ [এ]ই খাতাখানি কিনিয়া আনিয়াছেন: ইহাতে আমাদের বংশাবলীর [সং]ক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিবে।

আমরা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি। আমাদের [আ]দি নিবাস ২৪ পরগণায়, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব অনুমান ২৮ কি [৩]০ মাইল ব্যবধানস্থিত মজীলপুর গ্রামে। এই গ্রাম এক্ষণে জয়নগর [ম]উনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত। ঐ গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ [উ]দ্‌গাতা কোথা হইতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ [প]রম্পরাতে যাহা শুনিয়াছি তাহা এই। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে [য]খন রাজা মানসিংহ যশোর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু [দ]ত্ত নামে একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ যশোর বা তৎসন্নিকটবর্তী কোনও [স্থা]ন হইতে উঠিয়া আসিয়া এই গ্রামে বাস করেন। গ্রামটী গঙ্গার [চ]ড়াতে ১ স্থাপিত ছিল। তাহার উভয় পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। এখনও মজীলপুর ও জয়নগর এই উভয় গ্রামের মধ্যস্থিত ভূমিখণ্ডকে [গ]ঙ্গার বাদা বলে; এবং এখনও আমাদের গ্রামের সমুদয় পুষ্করিণীর [জ]ল পবিত্র গঙ্গাজল বলিয়া গণ্য হয়। পোর্তুগীজগণ যখম প্রথমে এদেশে আগমন করেন, তখন এই পথে আসিয়াছিলেন কিনা জানি [ন]া, কিন্তু আমার শৈশবে আমি শুনিয়াছি যে গ্রামের পূর্বভাগবর্তী [খ]ালে মাটির মধ্যে জাহাজের নঙ্গর কাছি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

চন্দ্রকেতু দত্তের ২ পরিবারগণ এখনও আছেন। তাঁহারা মজীলপুরের [দ]ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এরূপ জনশ্রুতি যে চন্দ্রকেতু দত্ত যখন এই গ্রামে [আ]সিয়া বাস করেন, তখন সঙ্গে তাঁহার যজ্ঞপুরোহিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতাও [এ]ই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা কি যশোর হইতে [আ]সিয়াছিলেন, অথবা দাক্ষিণাত্য উৎকল প্রদেশ হইতে আসিয়া চন্দ্রকেতু [দ]ত্তের সহিত সম্মিলিত হন, তাহা জানি না। উৎকলে এক শ্রেণীর [বৈ]দিক ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদিগকে ওতা বলে। ইহারা উদ্‌গাতা [ব]ংশজাত হইবেন।৩ আমরা বাৎস গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। বাৎস গোত্রীয়

বৈদিক ব্রাহ্মণ এখনও মান্দ্রাজ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়; এব
উদ্‌গাতা উপাধি বৈদিক উপাধির বৈদিক প্রক্রিয়া এখনও দাক্ষিণাত্যে
প্রচলিত আছে, এই সকল কারণে অনুমান করি তিনি তৈলঙ্গ, উৎকল
প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া থাকিবেন।

প্রিয়নাথ শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা হইতে একাদশ পুরুষে অবস্থিত।
এই বংশে চিরদিন সকলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি
ব্রাহ্মণোচিত কার্যই করিয়া আসিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শে
ভাগে এক আমাদের গ্রামে, আমাদের জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে ১০।১২টি
টোল চতুষ্পাঠী ছিল; তন্মধ্যে আমার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কারের
একটী। রামজয় ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে আমি দেখিয়াছি। আমা
বার বৎসর বয়সে অনুমান ১০৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কাল হয়
ইনি বহু বৎসর কলিকাতা সহরে ছিলেন, এবং পীলডাঙার রাধানাথ
মল্লিকের ভবনে কুল পুরোহিতের কাজ করিতেন। শেষ দশায় অ
হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন।

আমার পিতামহ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে
কাল হয়। তিনি স্বগ্রামস্থ কাণ্বায়ন বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ভবনে
বিবাহ করেন। আমার পিতামহী লক্ষ্মীদেবী গৌরাঙ্গী, তেজস্বিনী
নির্ভীক ও সত্যবাদিনী নারী ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল পদসম্ভ্রমে
ও গুণগৌরবে অগ্রগণ্য হওয়াতে তিনি কাহাকেও ডরাইতেন না।
১৮৩৩ সালের ঝড় হইয়া সাগর তরঙ্গ উঠিয়া দক্ষিণ দেশ ভাসিয়া
যায়। তৎপরেই দক্ষিণ দেশে ও বিষম কলেরা রোগ দেখা দেয়।
এই বোধ হয় কলেরার প্রথম প্রকাশ। সেই কলেরা রোগ আমাদের
গ্রামে প্রবেশ করে। সেই রোগে এক সপ্তাহ মধ্যে আমার পিতামহ
পিতামহী ও প্রপিতামহীর মৃত্যু হয়। তখন বোধহয় আমার পিতা
শ্রীহরানন্দ ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তশেখর ৭ [এর] বয়স ৬ কি ৭ বৎসর। অনুমান
১৮২৭ সালে তাঁহার জন্ম হয়। পিতামহ পিতামহীর মৃত্যু হইলে
বৃদ্ধ প্রপিতামহ, আমার জ্যেষ্ঠা পিতৃষসা আনন্দময়ী বা বিন্দী, কনিষ্ঠা
পিতৃষসা গণেশজননী, আমার পিতা ও আমার পিতৃব্য রামতারণ

এই কয়জন সংসারে থাকেন। বড়পিসীর আমার পিসামহাশয় ৺গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত বিবাহ হইয়া তিনি পিত্রালয়েই চিরদিন বাস করিতেছিলেন। পিসীকে আর শ্বশুর ঘরে যাইতে হয় নাই। বরং পিসামহাশয় শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ঘরজামাই হইয়া আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। পিসামহাশয় দত্ত বাড়ীতে পূজারি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমার পিতৃব্য রামতারণ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হয়। অনুমান দশ বৎসর বয়সে কলিকাতার দশ মাইল দক্ষিণপূর্ব-কোনবর্তী চাঙ্গড়িপোতা গ্রামের ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কন্যা গোলকমণি দেবীর [৭ম পৃষ্ঠা] সহিত আমার পিতার বিবাহ হয়। এই হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক। ইঁহাদের বংশও পূর্বে পূর্বে সকল যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্মই চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কখনও বিষয়কর্ম করেন নাই।

গোলকমণি দেবীর গর্ভে ১৮৪৭ সালে ৩১ জানুয়ারি দিবসে আমার জন্ম হয়। ঈশ্বর কৃপায় পিতামাতা এখনও জীবিত আছে। আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। বালককালে উন্মাদিনী নাম্নী আমার এক ভগিনীর মৃত্যু হয়। তৎপরে আমার আর তিন ভগিনী হয়। তাহাদের নাম যথাক্রমে ঠাকুরদাসী, বিলাসিনী ও কুসুমবালা। তিন জনেই এখন জীবিতা আছে। ঠাকুরদাসী এখনও সধবা [,] পুত্রকন্যা অনেকগুলি। বিলাসিনী ও কুসুম বিধবা [,] দুইজনেরই দুইটী করিয়া পুত্র ও এক একটী কন্যা।

অনুমান ১৮৫৯ সালে চাঙ্গড়িপোতার সন্নিকটবর্তী রাজপুর গ্রামের ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রথমা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত আমার প্রথম পরিণয় হয়। প্রসন্নময়ীর গর্ভে সর্ব জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা; তৎপরে তরঙ্গিনী, তৎপরে প্রিয়নাথ তৎপরে সুহাসিনী জন্মিয়াছে। সরোজিনী নামে আর একটি কন্যা ছিল সে অকালে গত হইয়াছে।

হেমলতা—১৮৬৮ সালের ১১ই আষাঢ়।

তরঙ্গিনী—১৮৭০ সালের ৮ই শ্রাবণ।

প্রিয়নাথ—১৮৭১ সালের ১৪ই আষাঢ়—

সুহাসিনী—১৮৭৩ সালের ২৫শে ডিসেম্বর।

কোনও পারিবারিক বিবাদের জন্য আমার পিতামাতা প্রসন্নময়ীর জীবদ্দশাতেই অনুমান ১৮৬৫ সালে আমাকে আবার বিবাহ দেন। এবারে বর্ধমান জেলার দেপুর নামক গ্রামের ৺অভয়াচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়। বিরাজমোহিনীর সন্তানাদি হয় নাই।

আমি শৈশবে গ্রামের পাঠশালা ও স্কুলে পড়িয়া ১৮৫৬ সালে কলিকাতায় আসি। আসিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করি। আমার বড় মামা ও আমার পিতা এ কলেজেই পড়িয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমার পিতা ঐ কালেজ হইতেই সিদ্ধান্তশেখর ৮ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭২ সালে আমি এম-এ, ও শাস্ত্রী উপাধি পাইয়া কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হই। ১৮৭৩ সালে আমার মাতুলের আদেশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি ইংরাজী স্কুলের সেক্রেটারি ও হেডমাষ্টার হইয়া যাই। [৮ম পৃষ্ঠা] ১৮৭৪ সালে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী ভবানীপুর নামক স্থানের সাউথ সুবার্বাণ স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসি। সেখান হইতে ১৮৭৬ সালে কলিকাতা হেয়ার স্কুলের হেড-পণ্ডিত ও Translation মাষ্টার হইয়া যাই। ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আপনাকে অর্পণ করি।

১৮৬৯ সালে আমি স্বর্গীয় আচার্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাস ১৮৬৫ সালেই জন্মিয়াছিল। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পুর্বেই আমার ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিবার ইচ্ছা জন্মে। ঐ কার্যে এখনও আছি।

১৯০১ সালের এপ্রেল মাসে কটকের সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম মধুসূদন রাও মহাশয়ের কন্যা অবন্তী দেবীর সহিত পুত্র প্রিয়নাথের বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে প্রিয়নাথের পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।

আমার তিন কন্যারই বিবাহ হইয়াছে। জ্যেষ্ঠা হেমলতার কলিকাতা উপ-নগরবর্তী খিদিরপুর নামক স্থানের ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইনি কায়স্থ বংশজ। মধ্যমা তরঙ্গিনী বা তুলীর যশোর জিলাস্থ বাঘআঁচড়া গ্রামের পিরালী বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মল্লিকের সহিত বিবাহ হইয়াছে; তৃতীয়া সুহাসিনীর নদীয়া জেলাস্থ আন্দুদীয়া গ্রামনিবাসী কুঞ্জলাল ঘোষের সহিত বিবাহ হইয়াছে। ইহারা তিনজনেই সৎলোক, ও তিনজনেই জীবিত। ১৯০১ সালের ৩রা জুন দিবসে প্রসন্নময়ী ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি বহু বৎসর বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া হস্তবিস্ফোটক হইয়া সেই রোগেই মারা যান।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) ৯

[৯ম পৃষ্ঠা] বালীগঞ্জ—২৩ আগষ্ট ১৯০৩। ৬ই ভাদ্র ১৩১০।১০

অদ্য প্রিয়নাথের নবজাত পুত্রের নামকরণ হইল। রেবতীনাথ ও অমরনাথ দুই নাম রাখা হইল। ইহার কারণ বাবা যে কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়াছেন তাহাতে রাশি নাম রেবতীনাথ উঠিয়াছে, মা, অমরনাথ নাম পছন্দ করিয়াছেন। তাই দুই নামই রাখা হইল। আমার বন্ধু চণ্ডীচরণ সেন, আচার্যের কার্য করিলেন। উপাসনাস্থলে অনেকগুলি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়নাথ ও বধূমাতা আপনাদের পরিচিত ব্যক্তিদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমার আত্মীয় দেখিয়া নিমন্ত্রণ করিতে গেলে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, সুতরাং তাহা করা যায় নাই। মাতা ঠাকুরাণী গতকল্য বাড়ী হইতে আসিয়াছেন। তিনি কিছুদিন এখানে থাকিবেন। তিনি খোকাকে দেখিয়া টাকা, সোনা, মুক্তা প্রভৃতি দিয়াছেন। বাবা অগ্রে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়া ২ দুই টাকা দিয়াছিলেন।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) ১১

১৯০৬।২৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অমরনাথের জন্মদিনের বিশেষ উপাসনা হইল এবং তাহার বিদ্যারম্ভ করান গেল। সায়ংকালে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া অমরনাথের কর আমার করের মধ্যে লইয়া তাহাকে 'অ'

'অা' 'ক' 'খ' শিখাইয়া ও তাহার নাম স্বাক্ষর করিয়া "ব্রহ্ম কৃপাহি" শিখাইলাম। হেমলতার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিদ্যারম্ভও ঐ প্রকারে করান গেল। তৎপরে ছেলেরা সকলে একত্রে আহার ও আনন্দ করিল। বর্তমানে আমার দশটী নাতি নাতনী (১) বিজলীবিহারী (হেমের জ্যেষ্ঠ পুত্র) (২) বিনয়বিহারী (হেমের দ্বিতীয় পুত্র) (৩) বীণাপাণি (হেমের প্রথমা কন্যা) (৪) ইলা (হেমের দ্বিতীয় কন্যা) (৫) মীরা (হেমের তৃতীয় কন্যা) (৬) করুণা (তরঙ্গিনীর কন্যা) (৭) কুহু (সুহাসিনীর প্রথমা কন্যা) (৮) সাধু (সুহাসিনীর প্রথম পুত্র) (৯) নন্দ (সুহাসিনীর কনিষ্ঠ পুত্র) (১০) অমরনাথ (প্রিয়নাথের পুত্র)

অমরনাথের বিকাশোন্মুখ চরিত্রের যে যে লক্ষণের আভাসগুলি পাওয়া যাইতেছে ১২ তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতেছে। এখন যতদূর দেখা যাইতেছে তাহাতে দেখিতেছি, ছেলেটী একগুঁয়ে যেটা ধরে সেটা সহজে ছাড়ে না; দ্বিতীয় অসহিষ্ণু অর্থাৎ ইহার ইচ্ছাকে বাধা দিলে সহ্য করে না; (৩য়) রাগী, যখন কোনও কারণে কুপিত হয় তখন যেন সহজে সংবরণ করিতে পারে না; যাকে সম্মুখে

[১০ম পৃষ্ঠা] পায় মারিতে প্রবৃত্ত হয়; (৪র্থ) আত্মাদর বিলক্ষণ প্রবল, একটী লণ্ঠনের নিকট থাইতে বসিয়াছিল সেটী তুলিয়া আমার পাতের নিকট দিয়া উহাকে উঠিয়া আমার কাছে আসিতে বলা হইল, কখনই আসিবে না, আমার জন্য লণ্ঠন তুলিয়া লওয়াতে আপনাকে অপমানিত বোধ করিল। (৫) মাতুলালয়ে যে এতদিন থাকিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কাহারও নাম করে না, যেন out of sight out of mind (৬) নিজের জিনিষ কাহাকেও দিতে চায় না, অন্যের জিনিষ লইতে চায় (৭ম) আপনার জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতে ভালবাসে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

১লা ডিসেম্বর ১৯০৬ ১৩

কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের পরিচয়ঃ

শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা ও চন্দ্রকেতু দত্ত সম্পর্কে কুলপঞ্জিকায় যে তথ্য দেওয়া আছে, তার অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায় না। যেটুকু অন্যত্র প্রদত্ত আছে, তাও অনুমানের উপর রচিত—কোনক্রমেই নির্ভরযোগ্য নয়। চন্দ্রকেতু দত্ত-এর বংশধরেরা আজও মজিলপুরে বাস করছেন। বস্তুতঃ, এখানের সংস্কৃতি এই দত্ত পরিবারেরই সৃষ্টি।

রামজয় ন্যায়ালঙ্কারকে শিবনাথ বাল্যকালে দেখেছেন। ১০৩ বছর বয়সে এঁর যখন মৃত্যু হয় তখন শিবনাথের বয়স বারো। এ সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতি-শক্তি ছিল প্রখর ও উজ্জ্বল। এঁর ধর্মপ্রবণতা লক্ষ্য করেই শিবনাথ-জননী গোলকমণি অন্যত্র দীক্ষা না নিয়ে এঁর কাছেই দীক্ষা নেন। পত্নী ছিলেন সুশীলা দেবী।

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য। কুলপঞ্জিকার পাঠক লক্ষ্য করবেন বংশলতিকায় পিতার নামের পর বিদ্যাসাগর উপাধি লিখলেও মধ্যে দুবার সিদ্ধান্তশেখর লিখেছেন। অনুমান করি শেষোক্ত উপাধিতেও তিনি ভূষিত ছিলে। তবে ইনি তাঁর গৌরবময় বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত নিজেও 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ছিলেন ভূষিত। একগুঁয়ে এই ব্যক্তিটির সত্যনিষ্ঠা ছিল প্রবাদস্থলীয়। পেশা শিক্ষকতা, স্ত্রীশিক্ষায় ছিলেন উৎসাহী। সাহিত্যে ছিল গভীর আগ্রহ। তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে 'নলোপাখ্যান' বিখ্যাত। পুত্রকে ধর্মান্তরের কারণে ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ সতেরো বছর পর পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন হয়। জন্ম আনুমানিক ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, শিবনাথের মৃত্যুর পর (১৯১৯) ইনি মারা যান। এঁর কনিষ্ঠভ্রাতা রামতারণ ভট্টাচার্য্য শিবনাথের বাল্যকালে মারা যান।

প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য—শিবনাথের প্রথম সন্তান ও একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৭১। মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। ইনিও পিতার ন্যায় ধর্মপ্রাণ ছিলেন। শিবনাথের 'বিধবার ছেলে' উপন্যাসের অপ্রকাশিত খসড়া

অবলম্বনে 'উমাকান্ত' উপন্যাস সম্পাদনা করেন এবং এর পরিচ্ছেদটি (উনিশ সংখ্যক) নিজে রচনা করেন। মৃত্যু ১৯৪২।

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য—এঁর জন্ম হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। পিতা প্রিয়নাথের মতই একমাত্র পুত্র। মাতা উড়িষ্যার ভক্তকবি মধুসূদন রাও এর তৃতীয়া কন্যা অবন্তী দেবী। শিবনাথের দ্বিতীয় পত্নী বিধবা নিঃসন্তান বিরাজমোহিনী এঁকে প্রভূত স্নেহে লালন করেন। শিবনাথ কুলপঞ্জিকার শেষাংশে এঁর শৈশব-লক্ষণ সম্পর্কে যে সব মতামত প্রকাশ করেছেন, তাঁর সারবত্তা ইনিই বিচারে সমর্থ। বর্তমান সম্পাদক সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অপারগ। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। এই 'কুলপঞ্জিকাটি' পেয়েছি তাঁরই সৌজন্যে। তাঁর স্নেহের কথা স্মরণ করে এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

মধুসূদন রাও—উড়িষ্যায় 'ভক্তকবি' নামে পরিচিত। জন্ম ১৮৫৩, মৃত্যু ১৯১২। 'ছন্দোমালা' (দুই খণ্ড), 'কুসুমাঞ্জলি', 'বসন্তসখা', 'উৎকলগাথা', 'শোকশ্লোক', 'সঙ্গীতমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। হরানন্দ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। হরানন্দ এঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর। প্রথম সন্তান বাসন্তী দেবীর সঙ্গে প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষা-বৈজ্ঞানিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বিবাহ দেন। দ্বিতীয় সন্তান ডাঃ জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুপরিচিতা সাহিত্যিক সুখলতা দেবীর (বর্তমানে রাও) বিবাহ হয়। তৃতীয় সন্তান অবন্তী দেবী; ডাকনাম কৃষ্ণা। জন্ম ১৮৮১। শ্বশুর শিবনাথের বহু অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করেন। 'ইংলণ্ডের ডায়েরী'-র সম্পাদিকা ও 'ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ' (১৩৭০) গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। নবম সন্তান সুকান্ত রাও (১৮৯৬)-এর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্র করুণার (কুলপঞ্জিকায় উল্লিখিত, শিবনাথের দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনীর কন্যা, মৃত্যু ১৯৫১) বিবাহ হয়।

হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন—সংস্কৃতে অসাধারণ পণ্ডিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতামহ। সে যুগের প্রখ্যাত সংবাদপত্র 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর

সম্পাদনায় ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কে সহায়তা করতেন। বস্তুত, হরচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত দুজনেই হাতিবাগানের কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র ছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—হরচন্দ্র ন্যায়রত্নের সুযোগ্য পুত্র। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সমধিক খ্যাত। নির্ভীক এই সাংবাদিক ছিলেন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক এবং বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 'সোমপ্রকাশ' দীর্ঘ কুড়ি বছর প্রকাশিত হয়। শিবনাথ তাঁর এই মাতুলের কাছ থেকেই সাহিত্য জীবনে এবং পারিবারিক জীবন সর্বাধিক স্নেহ পেয়েএসেছেন। 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনেই শিবনাথের সম্পাদক-জীবনের প্রথম সূচনা হয়।

গোলকমনি দেবী—অসাধারণ আত্মমর্যাদা সম্পন্না নারী। পুত্রকে প্রাণাধিক স্নেহ করতেন। পুত্রের ধর্মান্তরে কষ্ট পেলেও পুত্রের মঙ্গলার্থে একবার বুকের রক্ত উৎসর্গ করেছিলেন। সুরুচি ও শিক্ষার প্রথম পাঠ এই অসামান্যা সুন্দরী মাতার কাছ থেকে শিবনাথ পেয়েছিলেন।

উন্মাদিনী—শিবনাথের অব্যবহিত পরের বোন্। তাঁর চেয়ে ছ' বছরের ছোট। অত্যন্ত সুশ্রী এই বোন্‌টিকে শিবনাথ অসম্ভব ভালবাসতেন। এঁর মৃত্যু শিবনাথের মনে গভীর দাগ কাটে। লিচু খেয়ে এঁর মৃত্যু হয় বাল্যকালেই।

কেশবচন্দ্র সেন—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও নববিধানের প্রবর্তক। জন্ম—১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৮৪। পিতা প্যারীমোহন সেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ উপাধি দেন 'ব্রহ্মানন্দ'। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী এঁর কাছে দীক্ষিত হন ব্রাহ্মধর্মে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড যান। এঁর বক্তৃতায় ছিল মোহিনী শক্তি, আহ্বানে ছিল রাষ্ট্রনেতার সামর্থ।

বহু গ্রন্থের রচয়িতা হলেও 'জীবন বেদ'-এর আধ্যাত্মিক ইতিহাস অনবদ্য রচনা।

চণ্ডীচরণ সেন—শিবনাথ শাস্ত্রীর বন্ধু ও ব্রাহ্মনেতা। জীবৎকাল ১৮৪৫—১৯০৬। মহিলা কবি কামিনী রায় এঁর কন্যা। 'Uncle Tom's Cabin'-এর বঙ্গানুবাদকর্তা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। ঐতিহাসিক বিষয়ে প্রবল উৎসাহ ছিল। 'মহারাজ নন্দকুমার', 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ', 'ঝান্সীর রাণী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের রচয়িতা। 'মহারাজ নন্দকুমার' লিখে ইনি সরকার কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম এর রচনার মূল সুর। অমরনাথের নামকরণ উৎসবে ইনি আচার্যের কার্য নির্বাহ করেন।

ঠাকুরদাসী, বিলাসিনী ও কুসুমমালা—শিবনাথের তিন ভগিনী। এঁরা উন্মাদিনীর পর জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের বিশিষ্ট কোন পরিচয় নেই।

প্রসন্নময়ী দেবী—শিবনাথের প্রথম পত্নী। ইনি বাগ্‌দত্তা ছিলেন। শিবনাথের জন্মস্থান ও মাতুলালয় চাঙ্‌ড়িপোতার সন্নিকটস্থ রাজপুর গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। প্রথমে শ্বশুর কর্তৃক পরিত্যক্তা হলেও পরে শিবনাথ তাঁকে যোগ্য মর্যাদায় নিয়ে আসেন। শিবনাথের পুত্র কন্যারা এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মপত্নী প্রসন্নময়ীর উদার সহযোগিতাই শিবনাথকে গৃহ ও সমাজজীবনে এত উন্নত করেছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন বহুমূত্র ও অঙ্গুলিক্ষত রোগে এঁর মৃত্যু হয়।

বিরাজমোহিনী দেবী—শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী, বর্ধমান জেলার দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। আজীবন ব্রহ্মচারিণী, সন্তানহীনা ধর্মপত্নী। শিবনাথের মৃত্যুর পর এঁর পর মৃত্যু হয়।

শিবনাথের পুত্র কন্যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস'—রচয়িত্রী হিসাবে এক কালে শিক্ষা সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৮৬৮

খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মজিলপুরে এঁর জন্ম হয়। বিবাহ হয় বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকারের সঙ্গে। শিবনাথের মৃত্যুর পর বৎসর এঁর লেখা 'শিবনাথ-জীবনী' প্রকাশিত হয় ও সমাদর লাভ করে।

পুত্র প্রিয়নাথের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। ২য়া কন্যা তরঙ্গিনীর বিবাহ হয় বাঘ-আঁচড়া নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শিবনাথের ইংলণ্ড যাত্রার ঠিক দু'দিন পূর্বে—১৩-৪-১৮৮৮ তারিখে। সরোজিনী নামে তাঁর এক কন্যার বাল্যকালেই মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরে। এঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে শিবনাথ 'নবশোক' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি 'পুষ্পাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত আছে। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সুহাসিনীর মৃত্যুও শিবনাথের জীবৎকালেই ঘটে (১৫-১১-১৯০৬)।

পৌত্র অমরনাথের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। দৌহিত্র এবং দৌহিত্রীগণের মধ্যে হেমলতা দেবীর পুত্র-কন্যারাই উল্লেখযোগ্য হেমলতা দেবীর দুই পুত্র, তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ ডঃ বিজলী বিহারী সরকার ডি-এস্-সি, এফ, আর, এস্, ঈ (এডিনবরা)। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। সুখ্যাত বৈজ্ঞানিক হিসাবে ইনি পরিচিত। এঁর বিবাহ হয় প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবি, প্রত্নতাত্ত্বিক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে। একমাত্র পুত্র বিপ্লব বিহারী একুশ বছর বয়সে মারা যান। তিন কন্যা তপতী, অদিতি ও সেবতী। বিজলী বিহারী সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

দ্বিতীয় দৌহিত্র বিনয়বিহারী। ইনিও পরলোকগত। জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রী বীনাপাণির বিবাহ হয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী সুবর্ণপ্রভা বসুর দ্বিতীয় সন্তান ব্যারিষ্টার সুরেশমোহন বসুর সঙ্গে। দ্বিতীয়া দৌহিত্রী ইলা স্বামীর নামেই পরিচিত। এঁর স্বামী স্বনামখ্যাত অমলচন্দ্র হোম—সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

কনিষ্ঠা দৌহিত্রী শ্রীমতী মীরা সান্যাল—শ্রীযুক্ত হিরণকুমার

সান্যালের পত্নী। অন্যান্য যাঁদের পরিচয় দিলাম না, তাঁরা এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য নন। এখানেই কুলপঞ্জিকার সম্পাদনা সমাপ্ত হলো।

পাদটীকা ॥

১ এখানে 'গঙ্গার চড়াতে' শব্দদ্বয়ের পূর্বে শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছিলেন 'দ্বীপের মধ্যে ছিল'; পরে এটিকে কেটে 'গঙ্গার চড়াতে' বাক্যাংশটি লেখেন।

২ এই স্তবক আরম্ভের পূর্বে লেখা ছিল 'বোধ হয় প্রিয়না…' শব্দনিচয়। পরে কাটা হয়েছে।

৩ পূর্ববর্তী পংক্তির পরে '৴'—তোলা চিহ্ন দ্বারা নির্দেশের পর পরবর্তী পংক্তির মধ্যে বাক্যটি ক্ষুদ্রাকারে লিখিত।

৪ 'হঁবে'—কাটা।

৫ 'রাধানাথ'-এর পূর্বে লিখেছিলেন 'দ্বারকানাথ'। পরে কেটে দিয়ে 'রাধানাথ' লিখেছেন।

৬ 'দক্ষিণ দেশে' শব্দদ্বয় পরে (৴)—তোলা চিহ্ন-দ্বারা লিখিত।

৭ আগে লিখেছিলেন 'বিদ্যাসাগর।' পরে কেটে দিয়ে উপরে 'সিদ্ধান্তশেখর' লিখেছেন। সম্ভবত অনবধানবশত ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্নযুক্ত 'শেখরের' শব্দ না লিখে 'শেখর' লিখেছেন। অথচ এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা জানি তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত।

৮ সাত সংখ্যক পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য।

৯ প্রথম দিনের লেখার সমাপ্তি এই অষ্টম পৃষ্ঠাতেই। এই পৃষ্ঠায় কিছুটা অংশ সাদা বাকী প'ড়ে আছে।

১০ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিবস—ভাদ্রোৎসবের দিন। প্রায় ন'মাস পর পুনরায় লেখা আরম্ভ।

১১ এই স্বাক্ষরের বামপার্শ্বে যে সাদা জায়গা ছিল সেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে শিবনাথের পুত্রবধূ অবন্তী দেবী চার পঙ্‌ক্তিতে নিম্নোক্ত বিবরণ লিখে দিয়েছেন :

"১৯০৪। ১৫ই নভেম্বর, ৪১ নম্বর পদ্মপুকুর রোডের (বালিগঞ্জ) বাড়ীতে সুহাসিনীর মৃত্যু হয়। সে সময় শ্বশুর মহাশয়, ছোট মা ও আমি/উপস্থিত ছিলাম না। মৃত্যুর পরদিন শ্বশুর মহাশয় ও ছোট মা আসিয়া পৌঁছেন। / তিনটি অপোগণ্ড শিশু রাখিয়া সুহাসিনী চলিয়া গিয়াছেন। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অবন্তী দেবী।"

১২ এই শব্দটির পর থেকে নবম পৃষ্ঠার সমাপ্তি পর্যন্ত শাস্ত্রী মহাশয় খাতার পরিসরের দক্ষিণার্ধে সরু স্তম্ভাকারে লিখে গেছেন।

১৩ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের হাতে লেখা এখানেই শেষ হয়েছে। পরের পৃষ্ঠাগুলি পরিবারের অন্যান্য জনের লেখা। শেষ দিনের লেখার পরেও পণ্ডিত শাস্ত্রী আরও প্রায় তের বছর জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে 'আত্মচরিত' রচনা করেছেন। কিন্তু এই খাতায় আর কিছু লেখেন নি। সম্পাদক।

কল্যাণ সেনগুপ্ত

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়

গিয়ে দেখি বাড়ি নেই, কাক ভোরে উঠে চলে গেছে।
বিষণ্ণ হৃদয়ে ফিরে আসতে হয়। একা একা লাগে।
কি যে করি! শূন্যতায় কোথায় যে কার কাছে যাই!
রেস্তোঁরায় এক কাপ পাংশুবর্ণ পানীয়ের দিকে
অনিচ্ছুক আঙুল বাড়াই।

অনিচ্ছাকৃত

দুপায়ের পাতা ডোবে এমন সবুজ ঘাসে
অগ্নিদীপ্ত সিগারেট ছুঁড়ে
জানলা বন্ধ করে দিতে পারো অনায়াসে।

কয়েকটি সজীব শিশু দগ্ধ হবে সারারাত নিঃশব্দে অদূরে।

নিভৃত

এত রাতে আলো জেলো না বারান্দায়।
চমকে উঠবে জুঁই, দোপাটির চারা
উঠোনে। পাতার সুন্দর ঘোমটায়
কুঁড়িরা এখন বিভোর, আত্মহারা!

অন্তরাল

ঘুমোলে কী ভাবো জানতে ইচ্ছে করে ;
আমি, না আকাশ, নাকি সেই ছোটবেলা ?
ভোরে উঠে কের ঘরণী আমার ঘরে ।

তখনো কি বুকে ডাহুক পাখির মেলা ?

শান্তিকুমার ঘোষ

এবার হল না

এবার হল না গীত বসন্তের চন্দ্রাতপতলে
বর্ণছত্র ভেঙে দিলো শ্রোতাদের ক্রোধ
সন্ত্রাসের জাল কেন ছড়ায় ন্যগ্রোধ

এবার বাসন্তীবাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে বালক সেনানী
বৈরীদের তাজা খুনে খেলে হোলিখেলা
দারুণ অবেলা

এবার আসে নি নেমে ডানা-মেলা-দেবপরী
চাঁদের জোয়ারে যারা সন্তরণপ্রিয়
জ্যোৎস্না মরে গেলে জাগে ক্যারাভান,
উটের লহর
জলাভাবে ফেলে-যাওয়া নির্মিত শহর

ফুলের পক্ষে সকাল-সকাল

ফুলের পক্ষে সকাল-সকাল,
ফলের জন্য দেরী।
সমুদ্র কি তিথি মানে—

অসহ প্রণয়
ধরাতে পারে না তট।
এত গর্জনের মাঝে
চুমোয় মিলেছে
বিনম্র যুগল।

জড়ে কি জাগে নি প্রাণ—
চেতন বা অচেতন :
অমা-অন্ধকারে কে সে
করে চক্ষুদান।

মানস রায়চৌধুরী

দৃষ্টি

এখন উদার হতে ভালো লাগে
রুদ্ধশ্বাস মধ্যদিনে যখন তোমার চোখে আমার দুচোখ
ছায়া ছোট হতে হতে স্থির হয় একটি বিন্দুতে
এখন নিষ্কাম হাওয়া ভালো লাগে
ভালো লাগে ভিখারীকে সব দিয়ে দিতে।
তোমাকে নেওয়ার কথা ভালো কথা কে আর বুঝেছে
উড়ে যায় সিঁথির ভিতর দিয়ে বসন্তের হাওয়া
উড়ে যায় গোলায় লাগানো মই, বাড়ির দেওয়াল
আর গৃহস্থের কড়ি
তোমার দুচোখে চোখ রেখে এইসব মনে হয়।

বুকের গরাদ ভেঙে অসম্ভব শব্দ উঠে আসে
এ যেন সমুদ্র থেকে বন্দর ছাড়ার আর্তধ্বনি
এ যৌবন ছেড়ে হঠাৎ অনন্তে পাড়ি দেওয়া

যেন
ভেঙে পড়ে নীল ঢেউ, মাস্তলে দুপুর বেঁকে আছে
এ সময় সব কিছু দিয়ে দিতে লাগে বড়ো সুখ
এত সুখ কার কাছে কবে চেয়েছিলে ?
নিজেকে এসব প্রশ্ন করার আগুনে
পুড়ে যায় সামাজিক মুখ ও মুখোস

দিয়ে দিই পৃথিবীকে যা কিছু দেবার ছিলো, শুধু
সে মুহূর্ত ধরে রাখি প্রাণপণে
দুচোখে দুচোখ যেই হয়েছে আনত।

অসামান্য

সামান্য তোমার কাছে যাত্রা করে দেখেছি পালানো
তোমার অভ্যাস, এক সুন্দর বিকল্প
ভিখারীকে লোকে ভিক্ষা দেয় অথবা ভৎর্সনা
তুমি হাসো যেন এক নাটকে ঘনানো
অর্থবহ ব্যঞ্জনায় মুহূর্ত মাতাল করে মঞ্চ ছেড়ে যাওয়া।
মনে পড়ে অন্ধকারে দুচোখে বিদ্যুৎ হেনে কী দেবে বলেছো·
কী দেবে বলেছো তুমি ঘোর অন্ধকারে
এখন রৌদ্রের নীচে সবই পরিহাস
যানবাহনের ভিড়ে সমস্ত পথিক দেখে আমার দুর্দশা
এই অভিযোগে কোনো দিক্‌চিহ্ন নেই
স্রোতের ভিতরে কতো অজানা মাছের সন্তরণ
জীবনের কুম্ভীপাকে স্বর্গ ও নরক মেশে অর্থহীন প্রেমে
তোমার দুহাত থেকে খসে যায় রাঙানো আঙুল
বাহুমূলে ব্যথাখিন্ন আলিঙ্গন তাও ঝরে যায়
এসব কল্পিত তবু কল্পনায় আমি লেগে থাকি
একবার ভেবে দেখো অন্ধকারে
দুচোখে আগুন জ্বেলে কী দেবে বলেছো?

চিহ্ন

আজ নয়, অন্য দিন
    কোন অন্য দিন?

দিনপঞ্জী ধুলো খুঁটে খায়।
ক্যালেণ্ডারে মাকড়সার বাসা
কত মাস চলে গেলে সেই মাস আসে।
নিষ্ঠুরতা এতো নিষ্ঠুরতা
হাঁটু গেড়ে বসে আছি আযৌবন
কী ভীষণ শাস্তি নিতে থাকি
তবু কি ফুরোয় সব
বলে দাও এই তবে শেষ।
জেনে যাই একটি জীবন শেষে
কোনো গাছে শুকনো ফুলও নেই।
তাই সেই মলিন আঁচল থেকে তুলে নিই ধুলো
বুকে হেঁটে খুঁজে নিই কোথায় বীজের সম্ভাবনা
চতুর্দিকে ভাঙা কাঁচ
এরই মধ্যে ফুলদানি রয়েছে শাশ্বত
শূন্য থেকে ঝরে পড়ে শিশির বিন্দুর গূঢ় ব্যথা
সে তোমার নয় জানি
তবু ভালো লাগে এই ভেবে
কারো মমতার চিহ্ন আছে শিশিরেও।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

মানুষের জন্যে

সিংহদরোজায় মোমবাতি জ্বেলে
বুকের ভেতরে রেখো অন্ধকার
বর্মা সীমান্তের কোন পদ্মরাগমণি
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে দক্ষিণী মন্দিরে
প্রদক্ষিণপথের ঐ একান্তে যেমন
আলোছায়া, হাতে করে ধরা যায় অন্ধকার
দেবতার আশেপাশে গর্ভগৃহে অন্ধকার
মানুষের মুখের উপর কাঁপা আলোয়
বোঝা যায় না বুকের ভেতর
সেই অন্ধকার দেবসভা, না কি শয়তানের রাজধানী
না কি ক্লান্ত মানুষের জমাট নিঃস্বর !

দেখা হল

এ-বছর দেখা হল
এ-বছর ও-বছর নয়
মাঝখানে একটু-আধটু ঝড়
বিকেলের বৃষ্টি মাঝে মাঝে
তেমন কিছুই যেন নয়,
'কেমন, ভালো ত', 'ভালো' শুধু এই

যদিও মেরুনরঙা শাড়ি
যদিও যূথীর সাদা দাঁত
হাতের আঙুলগুলি গত বছরের
আসলে মাঝখানে সেই সময়
যে কখনো দরজা খুলে একটু আলোক ঢোকায় দেউড়ি দিয়ে
আবার বন্ধ করে
আসলে কিছুই কিছু নয়
সবই স্বপ্ন, সবই ভুলে যাওয়া।

নক্ষত্রের দিকে

কেউ না কেউ ছুটে আসবে
যদি খসে পড়ে তারা
একটি চাঁপা কি মালতী খসলে
কেউ কি কুড়োতে যায় না
অন্তরালবর্তিনী তারও কাছে এগোয় শত লক্ষ হাত
আর ঐ তারা কোটি কোটি অসংখ্যের থেকে
নিশ্চিত একটিই পড়লো দুঃশাসনের রক্তপানকালে
প্রত্যেকেই পা টেনে টেনে চলছে
হাত ঝুলছে এখানে ওখানে
এত মানুষ শতঝুরি বোট্যানিকসের
আসল মানুষ কই আসল গুঁড়িটা
শুধু ডাল, পাতা, বটগাছ একতাল মানুষ
এখন তারার মত কিছু পড়লে
জ্ঞানী নয়
একদল মানুষই ছুটে যাবে
ছুটে যাবে নক্ষত্রের দিকে।

হারিয়ে যায়

হারিয়ে যায় হারিয়ে যায় বলতে বলতে
সত্যিই হারিয়ে যায় একটি লোক
একটি একটি দুটি, দুটি একটি তিনটি
এরকম একটি পরিবার
অথচ কোথাও কোন ভূমিকম্প নেই
জলোচ্ছ্বাস মহামারী কিছুই হয় নি
আসলে সে হয়ত আছে তারা আছে

তাদের চারপাশে শুধু জেগে উঠছে ছ'তলা সাত তলা
তাদের পার্কের বেঞ্চি
তাদের পেনশন
তারা আছে
কেবল তাদের পাশে আশেপাশে হল্লাবাজ
কয়েকজন 'আছি আছি আছি' বলতে বলতে
দু চারজনকে ঢেকে ফেলছে
কে সব উল্টিয়ে দেখে কার বা সময়
কেউ থাকে, কেউ থাকে না
কেউ থাকে, কেউই থাকে না

কালীকৃষ্ণ গুহ

প্রেমের কবিতা

তোমার সঙ্গে এবার একটিও কথা বলা হয় নি, এই
দুঃখ আছে।
তুমি আমাকে প্রেমের কবিতা লিখতে বলেছিলে একদিন।

'তোমাদের ঈগল কোথায়?
ধুলোর ভিতর থেকে উঠে-আসা জয়ধ্বনি কোথায়?'
কবিতায় এইসব প্রশ্ন পছন্দ করো নি তুমি।

তুমি আমাকে এমন প্রেমের কবিতা লিখতে বলেছিলে,
যার ভিতরে স্তব্ধতা থাকবে, অন্ধকার প্রতিবেদন থাকবে।

কিভাবে

কিভাবে আরও সহজ হয়ে আসবে কবিতা!
প্রতিদিনই আমি জল দেখতে পাই,
গাছপালা এবং অন্ধমানুষ দেখতে পাই—
জল এবং গাছপালার পাশাপাশি কোন এক অন্ধকার
অপেক্ষা থাকে মানুষের, শ্রম এবং স্তোত্র থাকে।

কিন্তু এইসব কিভাবে কবিতার ভিতরে আসবে, গাছ কিভাবে আসবে!

শিশিরকুমার দাশ

আগুন

জ্বলে উঠেছে আগুন, তবু শরীর
পোড়ে না তাপে, চিতায় নেই বেদনা,
যদিও দেহে পাপের ঘন তমসা
স্বর্ণময়ী আগুন জ্বলে শুদ্ধ
তবুও দেখি পোড়ে না তাপে শরীর।

তবে কি এই আগুনে পাপ, আগুনে
নেই কি দাহ, মৃত্যুময়ী প্রতিভা?
এ শুধু তার ছদ্মবেশ, মোহিনী,
লুব্ধহীনা, স্বয়ং অপবিত্রা?

কিংবা এই আগুনে সব কালিমা
লুপ্ত হয়ে শরীরে জাগে জ্যোৎস্না
অগ্নি-জলে পাপের হয় অস্ত
যদিও পাপ দেহের প্রতিযোগিনী
শরীর তবু পায় না প্রতিহিংসা

আগুন জ্বলে, পোড়ে না তবু শরীর।

প্রিয়জনের মৃত্যুরজনীতে

সকলেই সুখী হোক, সুখী হোক
অন্তত আজ এই রাত্রি
সকলেই সুখী থাক, ভগবান।

আজকে আকাশ নীল
আজকে তারায় জ্যোতি অম্লান
সকলেই সুখী হোক
সকলেই সুখী থাক
অন্তত আজ এই রাত্রি।

ক্লান্ত ও পরাজিত যাত্রী
সরাইখানায় ভাঙা বিছানায়
আজকে ঘুমোক সুখে
ঘোড়াগুলো পাক আজ বিশ্রাম

আজকে আমার বুক প্রস্তর
জগতের দুঃখের সব ঝড়
এখানে করুক আজ পদাঘাত

সকলেই সুখী হোক, সুখী হোক
একদিন, একদিন, একরাত
অন্তত আজ এই রাত্রি
সকলেই সুখী হোক ভগবান।

প্রদীপ মুন্সী

খুলে যায়

বুকে কোন আলো ছিল না
যতদূর যাই
চোখের আলোয়
যতদূর দেখি
সমস্ত দুয়ারে বন্ধ চাবি
বুকে যখন জ্বলে উঠলো আলো
খুলে গেল সব দরজার চাবি

একটি শব্দের জন্য

অথচ
প্রকৃত এক নদী আছে
প্রকৃত এক সৎ আলো
আর
ভালো অন্ধকার আছে
প্রকৃত এক নারীর ছায়াময় প্রেম আছে
প্রতিটি শব্দ যখন পণ্য হয়ে যায়
একটি শব্দের ধ্বনির ভিতরে
সৃষ্টির শুদ্ধতা খুঁজি

নিয়তি

তুমি আমাকে নিয়ে গেলে
অভ্র জলা দেহাতি টিলায়
পাতাল কালিমা স্রোতে
কখন ভেসে গেছি
আমরা বুঝি নি

চলে যায়

কি করলে কি করলে
সারাজীবন
এমনি ভাবে টিঁকে থাকা
একে তোমরা বলছ বাঁচা
একটি গাড়ী নিদেন পঙ্কে ঘেরা-
ঘরের শীতল বাতাস
কি করলে কি করলে বলে
তিনি মিলিয়ে গেলেন লোকের ভীড়ে
পুরবী হাওয়ায় রক্তিম শিখা
উর্ধ্বে মিলায়
আর একা ঐ দরবেশ
ভস্ম হাতে দূরে
চলে যায়

আনন্দ কেন্‌টিস কুমারস্বামী

[ভারতীয় শিল্প যখন অন্ধকারের অন্তরালে বিশ্ববাসী কর্তৃক উপেক্ষিত ও অজ্ঞাত ছিল তখন তা পুনরুদ্ধারের কাজে যিনি অগ্রসর হয়ে এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষকে যিনি সর্বপ্রথম বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন, তিনিই বিশ্রুতকীর্তি শিল্প-শাস্ত্রী আনন্দ কেন্টিস্ কুমারস্বামী। তাঁর কাছে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা নেই। মার্শাল, কানিংহাম, ফার্গুসন, গ্রীয়ারসন, ভিনসেণ্ট স্মিথ ও হ্যাভেল প্রভৃতি বিশিষ্ট য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের লুপ্ত মহিমার পুনরুদ্ধারে প্রশংসনীয় প্রয়াস পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু কুমারস্বামীর কথা স্বতন্ত্র। একমাত্র ভগিনী নিবেদিতা ব্যতীত তাঁর মতো আর কেউ ভারতীয় জীবনধারা বা ভারত-আত্মার সুগভীরে প্রবেশ করে এর নিগূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। অথবা আর কেউ ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এমন ব্যাখ্যা দিতে বা ভাষ্য রচনা করতে পারেন নি। পাশ্চাত্যের কাছে এই ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার—তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল এই মহৎ কাজে নিবেদিত। তাঁর প্রতিভার পরিধি ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত; এক্ষেত্রে তাঁকে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সগোত্র বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'ভারতবন্ধু' আর রোমা রোলাঁ্যা তাঁকে একজন 'বিশ্বনাগরিক' (cosmopolitan man) বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ—ঠাকুর পরিবারের এই তিনটি প্রতিভার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন যেমন এসেছিলেন নিবেদিতার সংস্পর্শে।

তথাপি এই ভারতবন্ধুর নাম আজ বিস্মৃত বললেই হয়। এদেশের

শিল্পী মহলেই বা কজন তাঁর নাম জানে? এটা সত্যিই বেদনাদায়ক। কুমারস্বামী সম্পর্কে বর্তমানে স্বল্পতম যে কয়জন ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করেছেন এই নিবন্ধের লেখক তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম। ইনি কুমারস্বামী সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা দিয়েছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন। এখন তাঁর একটি তথ্যপূর্ণ জীবনচরিত রচনার কাজে ব্যাপৃত আছেন—এই গ্রন্থটি আগামী বৎসর কুমারস্বামী জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে। শ্রীবাগচীর চেষ্টাতেই কলকাতায় কুমারস্বামী জন্মশতবার্ষিকী কমিটি গঠিত হয়েছে, এই কমিটির সভাপতি প্রখ্যাত মনীষী ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। সম্পাদক—উত্তরস্থরি]

মনের গভীরে যাঁর অম্লান স্মৃতি সংস্কৃতিবান প্রত্যেকটি ভারত-সন্তানের অস্তিত্বকে নাড়া দেয়, জাগিয়ে তোলে তাদের অন্তরে অপূর্ব শিহরণ, সৌন্দর্যবোধের এক বিচিত্র অনুভূতি, সেই অদ্বিতীয় শিল্প-ইতিহাসবেত্তা ও ভারতবন্ধু আনন্দ কেন্টিস্ কুমারস্বামীর জন্মশতবার্ষিকী আর এক বছর পরেই অনুষ্ঠিত হবে। এই স্মরণোৎসব যাতে সর্বাংশে তাঁর যোগ্য হয় এবং সর্বভারতীয় স্তরে সাফল্যমণ্ডিত হয়, এখন থেকেই সেজন্য আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার ও সেই সঙ্গে শিল্পানুরাগী প্রত্যেক ভারতীয়ের মনে কুমারস্বামী-চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে নানারকম আলোচনার মাধ্যমে। ভগিনী নিবেদিতা, চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ যেমন ভারতীয় না হয়েও, অনেকের বিবেচনায় একজন ভারতীয়ের অধিক ছিলেন ও ভারতীয় জীবনধারার গভীরে প্রবেশ করে এই দেশকে এই জাতিকে তাঁদের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিলেন, কুমারস্বামী সম্পর্কেও ঠিক সেই কথা বলা চলে, বরং বেশি করেই বলা চলে। সিংহল তাঁর জন্মভূমি, ইংলণ্ড তাঁর শিক্ষার স্থল আর ভারতবর্ষ ছিল তাঁর মনোভূমি। রাজা রামমোহন রায় ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে স্থাপন করলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাকে স্থাপন করলেন বিশ্বধর্ম মহাসভায়, রবীন্দ্রনাথ সগৌরবে তাকে বসালেন

সাহিত্যের দরবারে আর বিশ্বের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারতের সম্মানিত আসন নির্ধারণ করলেন কুমারস্বামী। এই চারজনেই ভারত-জননীর মস্তকে যে দুর্লভ সম্ভ্রমের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন, সে-ইতিহাস আমরা ক'জন আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি? রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের কথা শিক্ষিত ভারতবাসী অল্প-বিস্তর জানে, কিন্তু হাজারে একজন ভারতবাসী কুমারস্বামী সম্পর্কে কিছু জানে কিনা সন্দেহ। জানা তো দূরের কথা, তিনি কে ছিলেন, কি করলেন—এসব খবর জানবার আগ্রহ পর্যন্ত তাদের মধ্যে নেই বললেই হয়। আসল কথা, তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এদেশে খুব কমই হয়ে থাকে, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে তাঁর পঠন-পাঠন কোথায়? দোকানে তাঁর বইগুলি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না। এই ভাবেই তিনি আজ আমাদের স্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছেন।

রূপকথার মতোই কুমারস্বামীর জীবন কথা। আপন মহত্ত্বে তিনি ছিলেন উদাসীন, তাই নিজের জীবনের কথা তিনি খুব কমই বলতেন। প্রচারসর্বস্ব যুগে তিনি ছিলেন একেবারেই প্রচার-বিমুখ। ধ্যানের জগতে, জ্ঞানের জগতে তিনি নিরন্তর বাস করতেন। যে সব বিবিধ উপাদানে গঠিত হয়েছিল কুমারস্বামী-মানস তা তিনি পেয়েছিলেন কতক তাঁর বংশগত ধারা থেকে, কতক শিক্ষা-দীক্ষা থেকে আর বাকী সবটাই ভারতীয় ধর্ম-দর্শন ও ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র থেকে। তাঁর জীবনের 'মিশন'ই ছিল ভারতবর্ষের ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কাছে সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন আর সত্য ব্যাখ্যা করা। পাশ্চাত্যের নিকট তিনিই ছিলেন সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত। ১৮৭৭ সালের ২২ আগষ্ট সিংহলের এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন তামিল পরিবারে কুমারস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। পিতা স্যর মুটু কুমারস্বামী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে একজন কৃতবিদ্য ব্যবহার-জীবী ছিলেন। এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম যিনি ব্যারিষ্টাররূপে ইংলণ্ডে প্রচুর প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কেণ্টের এক

বিশিষ্ট পরিবারের বিদুষী ও প্রিয়দর্শিনী কন্যা এলিজাবেথ ক্লে বিবির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সময়ে স্যর মুটুই ছিলেন ভারত-সংস্কৃতির একজন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা। পিতার এই প্রতিভা পুত্র আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। সিংহলের সকল রকম সামাজিক সংস্কারে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তিনি পালি ভাষায় রচিত কয়েকটি বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ সিংহলীয় ভাষায় করে খ্যাতিলাভ করেন। জাতিতে হিন্দু হলেও বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। বলা বাহুল্য, পিতার বুদ্ধ-প্রীতি পুত্রের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের নামানুসারে স্যর মুটু তাঁর পুত্রের নাম রাখেন আনন্দ; সেই নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল মায়ের জন্মস্থানের নাম। আনন্দের বয়স যখন দুই কি আড়াই বছর তখন স্যর মুটুর মৃত্যু হয়। তখন শিশু পুত্রকে মানুষ করার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন লেডি কুমারস্বামী। বলা বাহুল্য, স্ত্রী ও পুত্রের জন্য স্যর মুটু প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন—তার পরিমাণ ছিল ত্রিশ লক্ষ আমেরিকান ডলার।

স্বামীর মৃত্যুর পর লেডি কুমারস্বামী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করে, স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতে থাকেন। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে পুত্র যাতে মানুষ হয় সেজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, অর্থব্যয়েও কার্পণ্য করেন নি। লেডি কুমারস্বামী ১৯৩৯ সালে ৮৮ বছর বয়সে যখন প্রয়াত হলেন তখন তাঁর পুত্র অদ্বিতীয় শিল্পশাস্ত্রী হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন। শৈশবে পিতাকে হারিয়ে তাঁর মায়ের মধ্যে তিনি পিতা ও মাতা দুজনকেই পেয়েছিলেন, এমনি স্নেহময়ী ও কর্তব্যপরায়ণা মহিলা ছিলেন আনন্দ-জননী। তাই তো তাঁর মায়ের প্রসঙ্গে কুমারস্বামী বলতেন: 'আমি জীবনে যা হতে পেরেছি তা শুধু আমার মায়ের জন্যেই।' গ্লাউসেসটারসায়ারে ষ্টোনহাউসে অবস্থিত ওয়াইক্লিফ কলেজে শিক্ষালাভের পর, আনন্দ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন কলেজের ছাত্র তখন কলেজ থেকে এক মাইল দূরবর্তী স্থানের একটি ছাত্রাবাসে লেডী

কুমারস্বামী পুত্রের থাকার ব্যবস্থা করেন যাতে ছাত্রজীবনে কিছুটা কায়িক পরিশ্রম লাভ হয়। সেই সময় তিনি তাঁর পুত্রকে লাতিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করতে বলেছিলেন; 'এই দুটি ভাষা পরে তোমার কাজে লাগবে'—এই কথা পুত্রকে তিনি বলেছিলেন। কুমারস্বামীর পরবর্তী জীবনে তাঁর মায়ের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছিল। ছাত্রজীবনেই আনন্দ বিজ্ঞানের প্রতি, বিশেষ করে ভূতত্ত্ব ও খনি বিজ্ঞানের (Geology and Mines) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সিংহলের পাহাড় পর্বত ও গ্রাফাইট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানী-মহলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে তরুণ কুমারস্বামী দীর্ঘকাল বাদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও সিংহলের খনি বিভাগের প্রথম অধিকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার গৌরবলাভ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর। কয়েক বছর পরে সিংহলের ভূতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মৌলিক কাজের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত ডি. এস. সি উপাধি প্রদান করেন।

সিংহলে থাকতেই তিনি পাশ্চাত্য শিল্প-সভ্যতার বিধ্বংসী প্রভাব অনুভব করতে থাকেন—যার ফলে স্বদেশের চারু ও কারুশিল্প, স্বদেশের সংহতি সবকিছু বিনষ্ট হতে বসেছিল। তাঁর যেন চোখ খুলে গেল। সিংহলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে তিনি যেন নতুন রূপলোকের সন্ধান পেলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার দাবদাহ থেকে স্বদেশের সংস্কৃতি ও শিল্প কেমন করে রক্ষা পাবে—এইসব কথা চিন্তা করতে করতে তাঁর মনোজগতে জাগল এক নতুন অনুভূতি। এইভাবে কেটে গেল পাঁচ বছর। তারপর এই শতাব্দীর সূচনায় ১৯০৬ কি ১৯০৭ সালে তিনি সরকারী কর্মে ইস্তফা প্রদান করে চলে এলেন ভারতবর্ষে। শুরু হয় তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়। ভারতের লুপ্ত শিল্পমহিমা উপলব্ধি করবার জন্য প্রায় এক দশক কাল ধরে তিনি সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের চোখ আর নিবিড় অনুভূতি নিয়ে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্থানগুলি পর্যটন করতে লাগলেন। এই সময়েই তিনি

জোড়াসাঁকোর বিদগ্ধ ঠাকুর পরিবারের রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। তখনই তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে পরিচিত হন; এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Essays in National Idealism' প্রকাশিত হয়। জাতীয় জাগরণের সেই সংঘাতমুখর যুগে ভারতীয় জীবনধারা, ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কুমারস্বামী এই দেশকেই তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে গ্রহণ করেন। তিনি যেন ভারতের আত্মাকে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে আবিষ্কার করলেন। ভারতের শিল্পতীর্থ পরিক্রমা যখন শেষ হলো তখন তাঁর মূল্যবান সংগ্রহগুলি নিয়ে বারাণসীধামে একটি মিউজিয়াম স্থাপন করে তাঁর আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করবেন—এই ছিল কুমারস্বামীর অভিলাষ। কিন্তু কি তৎকালীন বিদেশী সরকার, কি দেশীয় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি, কেউই তাঁকে সহায়তা করতে সেদিন এগিয়ে আসেন নি। ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করে বিদেশে যাওয়ার কোন পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। কিন্তু কথায় বলে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। কুমারস্বামীরও ঠিক এই অবস্থা হয়েছিল। ১৯১৫ সালে তিনি আমেরিকা চলে যান সেখানকার পৃথিবী-বিখ্যাত বোষ্টন মিউজিয়ম অব ফাইন আর্টস-এর রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হয়ে। তাঁর সংগৃহীত শিল্পদ্রব্যগুলি বোষ্টন মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ ক্রয় করেন কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে। ভারতের পক্ষে যে এটা কতবড়ো ক্ষতি ছিল তা বলবার কথা নয়। এখানেই তিনি কীপার বা তত্ত্বাবধায়কের সম্মানিত পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরই প্রতিভা ও চেষ্টার ফলে এই মিউজিয়মের প্রাচ্য বিভাগটি একটি প্রকৃত শিল্পতীর্থে পরিণত হয় ও সারা পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের আকৃষ্ট করে। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বোষ্টন মিউজিয়মের যেন প্রাণপুরুষ এবং তাঁকে কেন্দ্র করেই সেদিন ওদেশে এক নবীন গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয় যারা ভারতের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও শিল্পের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিল। মিউজিয়মের বুলেটিনে ভারতশিল্প বিষয়ে তাঁর অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

যে ত্রিশ বৎসর কাল তিনি বোষ্টন মিউজিয়মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন সেই সময়ের মধ্যে তাঁর যে কয়খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো 'Introduction to Indian Art' ও 'History of Indian and Indonesian Art'; শেষোক্ত গ্রন্থটিতে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেখে বিস্মিত হতে হয়। দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প-ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে এটি আজও পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্বীকৃত। বোষ্টন মিউজিয়মের কাজ থেকে অবসর নেবার পর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাগারটিসহ তিনি এই দেশেই ফিরে হিমালয়ের পাদদেশে কোন এক নিভৃত স্থানে জীবনের শেষ দিনগুলি যাপন করবেন—এই ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। আলমোড়াতে তাঁর জন্য একটি স্থানও নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু তার পূর্বে ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

সংক্ষেপে এই হলো কুমারস্বামীর জীবনকথা। এর চেয়েও বড় তাঁর মনোজগতের কথা। তার নাগাল পাওয়া খুব সহজ নয়। তাঁর ধ্যানের মধ্যে ফুটে উঠেছিল ভারত-শিল্পের মর্মকথা, ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের নিগূঢ় পরিচয়। ভারতের শিল্প-আত্মার যথার্থ পরিচয় পেয়েছিলেন বলেই না তিনি বলতে পেরেছিলেন: 'Nations are created by poets and artists, not by merchants and politicians. In art lie the deepest life principles.' আরো বলেছেন: হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু আর্ট পৌত্তলিক ধর্মের প্রকাশ নয়, পরন্তু হিন্দু ধর্ম হলো শিল্পের মাধ্যমে ভগবৎ আরাধনা—worship of God through art; তিনি সারা জীবন ধরে এই কথাই প্রমাণ করে গেছেন অজস্র রচনার মাধ্যমে যে হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না, তারা পৌত্তলিক নয়। তিনি ব্যাখ্যা করে তার ব্যাখ্যা জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করে গেছেন। সৌন্দর্যের বা যাকে আমরা ইংরেজীতে aesthetics বলি তারই প্রকাশ হলো ভারতবর্ষ। ভারত শিল্পের তিনিই প্রধান ঐতিহাসিক। ভারতীয়ের অধিক তিনি কতখানি ভারতীয় ছিলেন তা এই উদ্ধৃতিটি পাঠ করলেই বোঝা যাবে: 'যদি ভারতবর্ষের শিল্প ও সাংস্কৃতিক মহিমা বুঝতে চাও, তবে যাও অজন্তা,

ইলোরা ও মহাবলীপুরমে, অথবা একবার পরিদর্শন করে এসো নালন্দা, রাজগৃহ অথবা কোণারকের ধ্বংসাবশেষগুলি। তাহলে তোমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ভারতের অতীত, তার সকল মহিমা, সকল সৌন্দর্য নিয়ে; কাশী ও হরিদ্বারের গঙ্গায় স্রোতধারার কলতানের মধ্যে শুনতে পাবে বিগত দিনের কণ্ঠস্বর······যুগ-যুগান্তের ভারত মরে নি, আজও বেঁচে আছে তার সৃষ্টির শেষ কথা বলার জন্য।' ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, তিনি বাণী দিলেন: **'Be yourself.'** এই বাণী আজও তার মূল্য হারায়নি। এই বাণীর উদ্গোক্তাকে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। বিস্মৃত হওয়া কঠিন নটরাজ মূর্তির যথার্থ দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাতাকে। যিনি তাঁর সকল অস্তিত্বের মধ্যে ভারত শিল্পের নিগূঢ় পরিচয় পেয়েছিলেন, নীরব পাষাণে ও প্রস্তরে, রাজপুত চিত্রকলায় অপূর্ব বর্ণসুষমার মধ্যে সমাহিত ছিল যে রহস্য, তাকেই যিনি এমনভাবে অনুধাবন করেছিলেন, সেই কুমারস্বামীর ধ্যানের ভারতকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে পেতে হবে।

মণি বাগচী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিষিদ্ধ বর্ষণ

বৃষ্টি নামে
নিঃশব্দে

ভেজা বাতাসে
ফুলের
দীর্ঘশ্বাস

ঘুম থেকে
স্বপ্নে

জাগরণ···

প্রবাহিত জীবন

ভালবাসার কান্নাগুলি
নির্বাসনের
একাকীত্বে···

ভিক্ষা চাইবে ?
দেবার মানুষ নেই।

অরুণ ভট্টাচার্য

এক বোন পারুল

তারা পরস্পর স্বাভাবিক নামে পরিচিত নয়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ইত্যাদি অংকে
তারা চিহ্নিত হয়েছিল।
নাক মুখ চোখের ডৌল, বা
মুখের ছাঁচে ১ থেকে ২ বা ৪ থেকে ৫
এর কোন পার্থক্য ছিল না।
বন্ধুরা এবম্বিধ নামে তাদের ডাকত
এবং তারা যথারীতি সেই আহ্বানে
সাড়া দিত।

৭ এর বোন-কে কি নামে ডাকা হবে
এ নিয়ে এক গোপন বৈঠক বসে গেল।
তাকে কি ৮ নামে অভিহিত করা হবে?
না কোন মানবিক নাম দেওয়া হবে?

বস্তুত তারও নাক মুখে, চোখের ডৌল বা
মুখের ছাঁচে কোন পার্থক্য ছিল না।
৮ নম্বর নামে তার কোন আপত্তি ছিল না।

এক সময় সে বুঝতে শিখল, সে
এবং তার ভায়েরা, অর্থাৎ ১ থেকে ৭,
প্রকৃতিতে ভিন্ন, দেহগত সুষমায় ভিন্ন,
তার জগৎ পৃথক, তার গন্ধ-বর্ণ-সুষমা
আলাদা, স্বাদ বৈচিত্র্য অপরূপ,
তার আনন্দ বেদনা তারই নিজস্ব।
অকারণে তার দুঃখ,
অকারণে তার আনন্দ।

১ থেকে ৭ নম্বর ভাইদের সে ডেকে
বোঝাতে চাইলো। তারা বুঝলো না।

সারা রাত্রি সে অঝোরে কাঁদলো।

সকাল বেলা বাগানে গিয়ে একটি
যূঁথী, একটি চম্পক, একটি
বকুল, একটি মালতী, একটি শিরীষ
একটি গোলাপ, একটি পদ্ম
১ থেকে ৭ নম্বর ভাইদের দিল।
বললো, বলতো এরা কে।
সবাই বললো 'ফুল'।
সে বললো, তারও পরে?
১ থেকে ৭ নম্বর পরস্পর এ ওর
মুখের দিকে তাকালো।

সে একে একে চিনিয়ে দিল বকুল, চিনিয়ে
দিল মালতী ইত্যাদি।

১ থেকে ৭ নম্বরের কি যে
হোল, হঠাৎ তারা অঝোরে
কাঁদলো। কাঁদতে থাকলো।

পরের দিন সবাই তাদের নম্বর
মুছে ফেললো। যে যার যেমন
ইচ্ছে নাম ধরে ডাকলো। আর

তার নাম দিল পারুল।

আলোক সরকার

কাছাকাছি

তার সঠিক পরিচয় জানতে দেবার আগেই
সে দেখালো তার বাড়ি
মলিন একটা উঠোন তার পরেই শুরু হয়েছে সিঁড়ি

উঠোনে লঙ্কাজবা গাছ আছে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালো
দোপাটি ফুলের গাছ, কৃষ্ণকলি।
আরো যখন জানতে চাইলুম দেখালো সাজানো একটা ঘর।

সেইখানে কাঠের আলমারি আছে বড়ো পালঙ্কের নীচে
তাড়া-বাঁধা কাগজপত্র ফ্রেম ভেঙে-যাওয়া ছবি।
সবকিছুই দেখতে থাকলুম, বল্লো, দক্ষিণে আছে একটা বারান্দা

তার সঠিক পরিচয় জানতে দেবার আগেই
সে নিয়ে গেলো তার বারান্দায়—
সামনেই আগুন-জ্বলা কৃষ্ণচূড়া তার ফাঁকে শ্লেট রঙের আকাশ।

আরো যখন জানতে চাইলুম সে ফিরে এলো তার ঘরে
আস্তে আস্তে বসলো দুহাতমেলা চেয়ারে
আস্তে আস্তে চোখ বুজলো আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো কখন।

কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলুম কাছাকাছি, তার মুখ
ভোরবেলার ভিজে ঘাসের মতো, ছড়িয়ে থাকা
সাদা শিউলি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলুম, খুব কাছাকাছি
দাঁড়িয়ে থাকলুম তার।

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

কেন এমন

কেন এমন পথে নামার কি অঙ্গীকার রক্তে নিয়েছিলাম তুলে
নাকি অনেক সুখের ভালোবাসার নেশায়
কাছে পেতে সারাজীবন এ রক্তপাত
কাছে ছুঁতে মাতাল হয়ে এমন খেলায় ভেসে যাওয়ার
কি অঙ্গীকার দিয়েছিলাম কোন পাথরে লিখেছিলাম
কি শর্ত তার শুধু ডুবে নিখোঁজ হওয়ার ?

কবে যে কোন রাতের শেষের স্বপ্ন নিয়ে জেগেছিলাম
কি মুখ নিয়ে উঠেছিলাম

তাকে খোঁজার তাকে আলোয় পাবার নেশায়
খুঁজে মরছি খুঁজে মরছি পাথর ভাঙছি

সে মুখ আমায় তাড়িয়ে নেয় হাজার মুখের রেখায় রেখায়
তাকে দেখার তাকে পাবার বিচ্ছিন্নতায় বিন্দু বিন্দু
তাকে খুঁজি
নাকি মিথ্যে ডুবে আছি ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি আরো অতল
পাওয়ার ভাগ্যে
নাকি অন্ধ সাপের মতো গর্তে আমার স্বর্গ দেখি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হাওয়া

অবাধ্য হাওয়া এখানেও ঢোকে
সুনসান এই ছোট সংসার
তাকেও পাগল ত্রস্ত মাতাল
করেছে ও হাওয়া বেভুল আউল
উত্তুরে নয় দক্ষিণী নয়
অর্গলহীন এলোমেলো হাওয়া
ব্যথা শীত ভয় রোদ আলো জল
জড়িয়ে চিবুকে দুহাতে দুপায়ে
সুতীক্ষ্ণ শিসে ঘর তোলপাড় উদ্দাম হাওয়া অপার অবাধ
ঢুকেছে আমার ছোট ঘরটিতে

দেরাজ বাকসো আলমারি ছেনে
যে ভাবে ইচ্ছে ছিঁড়েছে ছেনেছে
সন্তর্পিত সকল আমার
উড়িয়ে নিয়েছে মাটির ওপর ছিন্ন পাতার মতন আমাকে

আজকে হঠাৎ এমন সকালে
যখন আমার বাড়ি-ভরা কাজ
তখনই কেন যে তাতারের পায়ে
উত্তুরে নয় দক্ষিণী নয়
আলো-ছায়া-কাঁপা শান্ত বলয়ে
সর্বনাশের দশ দিক ছেপে
অর্গলহীন সাঁই সাঁই হাওয়া…

দীপংকর দাশগুপ্ত

আমি যখন

আমি যখন আমার দিকে তাকাই
কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখি না।

এখনো চোখ বুঁজলে দেখতে পাই,
ফুলভারাবনত বৃক্ষ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছো প্রাঙ্গনে,
কোজাগরী চাঁদ মধ্য আকাশে।
জ্যোৎস্নায় নদীর চরে
সাদা মেঘের উপর থেকে

একে একে নেমে আসছে পরিরা,
পাল তুলে নিঃশব্দে ভেসে এলো ময়ূরপঙ্খি,
বাঁশির স্বরে কেঁপে উঠলো শুভ্র কাশের বন,
এবার মৃত্যু শুরু হবে।

অথচ আমি যখন আমার দিকে তাকাই
তখন কুয়াশা ছাড়া আর কিছু দেখি না॥

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বৃক্ষ

আমি এক বৃক্ষ ধু-ধু ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে।
হাওয়ায় উস্কখুস্ক-চুল, বাউল-বৈরাগীর মতো
বিলম্বিত খঞ্জনি বাজাচ্ছি স্বর-মূর্ছনায় বা পদ্য-গ্রন্থনার চারুশিল্পে
ঐ শাখা-প্রশাখাগুলিও উপর্যুপরি তখন
মাটিতে খটাখট আওয়াজে অস্থির—
এলোমেলো নিদাঘ-সমীরণে।

বাউল-উত্তরীয়ের মতন আমারও হলুদ বসন।
বিবর্জিত বৃক্ষ আমি
ধুলো-ওড়া ঘূর্ণি-ঝড়ে দুলে উঠছি, নাচছি বিষাদময়তায়, খ্যাপা।
কখনো সাড়াশব্দহীন আধিভৌতিক নিস্তব্ধতা—
শ্রান্ত দীঘি ছায়ার আবরণে যেমন থাকে নিঃঝুম,

অথবা জলের ভেতরে অবগাহনে মৌনী,
মোহজাল ঔষধি ক্রিয়ায় আমাক জড়িয়ে ধরে
আষ্টেপৃষ্ঠে বেতসলতা বৃক্ষকে,
উর্ণনাভ-লতাতন্তু অসহায় পোকা-মাকড়,
আমিও প্রান্তরে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ি হৃদয়-নিহিত চৈতন্য-বিলোপে।
বিমূঢ় বৃক্ষ আমি দাঁড়িয়ে আছি উষর মাঠের মধ্যে
ভালবাসা-সহৃদয়তা হীন;
আমার বিস্তীর্ণ শাখার উপরে
পাখির কল-কাকলির রৌদ্র বিস্তার নেই,
নেই পালক-মসৃণ
কাঠবিড়ালির দৃশ্যময় নৃত্য-বাহার।
চোখের সামনে নেই বনরাজিনীলা—ফুল্ল-কুসুম পাপ্‌ড়িতে
ডালি সাজিয়ে উপঢৌকন,
অলিগুঞ্জন বিলাস বসন্ত-সমীরে,
বরং, জ্যৈষ্ঠের দাবদাহ শুষ্ক পাতার মর্মর
মৃত্তিকার ধূসর রিক্ততা, কেবল আমারই জন্য—
বৈরী-হাওয়ার ভ্রূকুটি-শাসন।

হেনা হালদার

মুঠো খুললেই

তুমি একবার মুঠো খুললেই প্রেমিক হয়ে যাব
দু'চোখে দুই হাত ছোঁয়ালেই সমস্ত স্বর্ণাভ।
এসব কথা সত্যি ভাবছি এখনো বুঝি ভাবো?
না হয় প্রেমিক হলেই আমরা কেউ কি বদলাবো?

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

চৈত্রদিনের কবিতা

তীব্র দহনে ভিতর বাহির
জ্বলে পুড়ে যায় জ্বলে পুড়ে যায়
চৈত্র দিনের রচনাগুচ্ছ
বিদায় নিদাঘে পাণ্ডুরপ্রায় !
তুমি বলেছিলে যতো হোক বেলা
অসময় হোক তবু দেখা হবে,
পত্রপুঞ্জ বিরল ক্রমশ
রজনীগন্ধা শুকোয় নীরবে ;

তীব্র দহনে ভিতর বাহির
জ্বলে পুড়ে যায় জ্বলে পুড়ে যায়
মেঘ দেবে তুমি কথা দিয়েছিলে
কী লাভ সে আসা ভরা বর্ষায়

বেণু দত্তরায়

দ্যাখো সারারাত্রিই

দ্যাখো
সারারাত্রিই
তোমার চোখ উঠেছে
পাতাগুলি
ভিজে ভিজে

জানোয়ারের চোখের মতো
লাল
কার ঘরে গিয়েছিলে
রাত্রে
জাফরাণী
মদ গিলে এলে
চিকন আঙুলের ঠোনায়
এখন চোখের পাতা বোজা
কঠিন হয়েছে ।

নিখিলকুমার নন্দী

কিছুই তার মতো নয়

না, কিছুই কোন সুখ কোন দুঃখ তার মতো নয়

যে পথেই এসে থাক
যে-স্রোতেই ভেসে যাক
সে শুধু তারই মতো উদ্বেল উত্তরঙ্গ আনন্দসময়
পরিকীর্ণ নীল নীল বাসনায়
রক্তগোলাপে সম্ভাবনায়
তেমন স্বচ্ছন্দ বেশবাস কথা, সচ্ছলতা বর্ষা ও বসনভেজা
সাবলীল শরীরের হৃদয়ের ধ্বনি
তেমন চুলের সোনা পশ্চিমী রোদের
সুডৌল মুখের হাসি গালে টোল তিলে তিলে বোনা সংবেদনবোধের

রেশমপশমী সাজ কারুকাজ বসন্তে, বা শীতের গুণ্ঠনী
অসুলভ অপরূপ আবির্ভাবে ; অথচ সে এসেছিল চলতে-চলতে
ফিরে গেল ব্যথা দিয়ে-নিয়ে মালা-মণিহার ছিঁড়তে ছিঁড়তে
কিছু কথা চুম্বনে ও আলিঙ্গনে সরস বাসন্তীরং অনায়াসে বলতে-বলতে
সুবিরল : কত সে সহজ ছিল সুন্দর বন্দরের তীর এই তরী ভিড়তে ;
অথচ ভিড়ি নি, সেও চেষ্টামাত্র করে নি কঠিন
সহযাত্রী সমদুঃখী ক'টি মাত্র জানলা দরজা দিল খুলে
কিছু সুবাতাস কিছু রমণীয় উদয়াস্ত দিন
উপহার ক'রে তুলে আপনিই ঠেলে দিল নৌকাখানা
দুরান্ত অকূলে।
অথচ চোখের কোণে কিছু দুর্লভ তৃষ্ণা-মদির গোলাপ স্তনে
অটুট জঙ্ঘায় শিহরিত কৃষ্ণচূড়া
শিখায়িত ব্রতী ও বিব্রত
হাতে কিছু তৃণময় স্নেহস্পর্শ দেহতানপুরা
দুরন্ত ধ্রুপদী দোলা গমকে চমকে ছিল বাঁকে বাঁকে চ্ছলচ্ছল
নদীর সঙ্গত।

তুমুল অতুলনীয় অনুদ্যত তবু উৎসুক
আশা ও আশ্বাসে ছিল শাশ্বত সম্প্রতি
তার মুখে মুখ রেখে হাত রেখে বুকে সুখ কত না অসুখ ;
তবু সে সমস্ত সুখদুঃখাতীত নিরপেক্ষ সাবলীল আনন্দ আনন্দময় গতি

না, তার রূপ ও গুণ-অনুরূপ আর-কেউ কিছু নয়, প্রণয়বর্ষণে
কটিদেশ নীবিবন্ধ বক্ষোবাস শ্রোণীভার
সবই তার অনর্গল বেপরোয়া ; তবু সে তটস্থ এক তন্ময়তা সব আকর্ষণে

না, না, কিছুই কোন সুখ কোন দুঃখ তার মতো সূক্ষ্ম সুকুমার নয় ;…

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

লোকটা

কখন কোন্ ফাঁকে লোকটা ময়লা কাগজের বস্তা কাঁধে নিয়ে
দাঁড়িয়েছিল প্রতিমার সামনে
হৈ হৈ ক'রে উঠলো ছেলের দল
মণ্ডপের ত্রিসীমানা থেকে দিল তাড়িয়ে।
মণ্ডপের বিপরীতে আমার বাড়ী
বাড়ীর জানালা থেকেই তাকে দেখতে পেলাম;
পুজোর পাণ্ডারা হৈ হৈ ক'রে উঠলো।
আমারও মনে হোলো
ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম নয়?

লোকটা চলে গেল
ঢাকের বোল মুখে বাজাতে বাজাতে
চলে গেলো
একজন অভিজ্ঞ ঢাকির মতো
নাচতে নাচতে
চলে গেলো—
কি জানি হয়তো বা একদিন সে ছিলো
ঢাকি
পুজায় মণ্ডপে তারও পড়তো ডাক
মা হয়তো আজ চিনতে পারেন নি তাকে
ঢাকহীন 'পরাণ' ঢাকিকে
সে চলে গেলো—

যাবার সময়
মুখে ঢাকের বোল
বাজাতে বাজাতে
চলে গেলো।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

কোনো তিতির শিকারীর প্রতি

বাদামতলার জলে তুমি স্নান করে নাও,
কেননা পাখিরা একবার জখম হলে
আর ফিরে আসে না;
আজ তিতির নাচবে না।

বাদামতলার জলে তুমি স্নান করে নাও,
কেননা উল্টো হাওয়া বইলে
মেঘেরা ছায়া ফেলে না;
আজ বৃষ্টি নামবে না।

বাদামতলার জলে তুমি স্নান করে নাও;
কেননা মেয়েরা আঁচলে গিঁঠ দিলে
আর মুখ ফেরায় না;
আজ রঞ্জনা আসবে না।

পরিমল চক্রবর্তী

অভিজ্ঞতা-বিষয়ক চতুর্দশপদাবলী

যতোই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা ততো বেড়ে যায়।
অভিজ্ঞতা যেন এক বয়সিনী নারীর মতন
আমাকে নির্মাণ করে তিলে-তিলে, স্নেহ ও ক্ষমায়।
জীবনের পথে-পথে ঘুরে-ঘুরে অরূপ রতন
যা কিছু পেয়েছি খুঁজে, অভিজ্ঞতা-পরিশুদ্ধ সব;
সুখ বলো, দুঃখ বলো; কিংবা সুখ-দুঃখের নির্যাস
যা কিছু করেছি জমা গর্ভবতী স্মৃতির কৌটায়,
যে ক'টি স্বপ্নের বীজ বৃক্ষ হয়ে সুখের বৈভব
জীবনে ঘনিষ্ঠ করে, আমাকে বাঁচায় বারোমাস—
প্রচণ্ড ক্ষুধায় তারা জন্মান্তরে অভিজ্ঞতা চায়।
        যতোই বয়স বাড়ে অভিজ্ঞতা ততো দীপ্ত হয়;
        হ'তে হ'তে অবশেষে জ্বলে ওঠে, ঠিক যেন মণি
        জীবন সর্পের শিরে, অবগাঢ় আভায় অক্ষয়।
অভিজ্ঞতা জীবনের সারাৎসার, হিরণ্ময় খনি॥

বাসুদেব দেব

ছুটির সকাল

আমাকে সে জানে
আমার দুঃখের ভাষা মুদ্রা দোষ
মাঝরাতে উঠে হঠাৎ পিপাসা মৃত্যুভয়
সব

পায়ের ওপর দিয়ে ছুটির সকালে
চলে যায় পদ্ম গোখুরাটি
সে জানে আমার গতিবিধি
রহস্যগ্রন্থের পরিণাম চায়ের সময়
আমার ঘামের গন্ধ…সবকিছু
সব

সে আমাকে দেখে যায়
সুখে দুঃখে
সে আমাকে দয়া করে রোজ

কায়সুল হক

ঘরে ও বাহিরে

ঘরে ফুলদানি ভরা ফুল,
বাইরে বাগানে চাঁপা, বকুল ও শিমুল
সৌরভ ছড়ায়।

সারাদিন ঘর ও বাহির
নিয়ে চলে স্রোত এই সময়, নদীর।
আপন গৌরবে দেখে, নিয়ত বাজায় করতাল।

দগ্ধদিন শেষে বৃষ্টি নামে,
মাথা তোলে নানা চারাগাছ—
যেন ঘরে এই ফুলদানি, ভরা ফুল,
বাইরে বাগানে চাঁপা, বকুল শিমুল।

তুলসী মুখোপাধ্যায়

যাবার যা

যাবার যা সবই গেছে
থাকার মধ্যে
শূন্য গৃহ : মাকড়রাজা
সমস্তক্ষণ হা-হা বাতাস
বিসর্জনের বাজনা বাজা !

যাবার যা সবই গেছে
ফুলের গন্ধ নিভে গেছে
গাছের ছায়া মরে গেছে
রোদের মায়া ছাই হয়েছে
যাবার যা সবই গেছে

থাকার মধ্যে
শূন্য গৃহ : মাকড়রাজা
সমস্তক্ষণ নকল পোশাক
সমস্তক্ষণ নকলরাজা।

দেবী রায়

হাত রেখেছে, পায়ে

কেউ না কেউ, কখনো না কখনো
এ জীবনে

হেঁট হয়ে রেখেছো' হাত পায়ে
সর্বাঙ্গ বাঁকিয়ে
যেই না ছুঁয়েছে, 'বুড়ো আঙুল!'

প্রথাসিদ্ধ নিয়মে, বরাভয় মুদ্রায়
তুলেছো
হয়তো বা হাত
আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় :
'তুমি অশুচি, তুমি অপবিত্র, কলংক—
তোমায় ঢেকে আছে
দেহে-মনে,
বিহ্বল তুমি, ভেবেছো কি একবারো
ঐ প্রণাম নেওয়ার
তুমি কি সবিশেষ যোগ্য ?

ধীরে ধীরে নিচু হয়ে বসি
অবনত মস্তকে, যে ভেবেছে
মুক্তি, প্রাণপণ যে হতে চায় আরোগ্য !

মনে মনে
ভেবে নিয়ে একবার
পিছু হটে ত্বরিতে-ই সরে যায়
এমন কি, বাধাও সে দিতে চায়
মুখে, 'ছিঃ ছিঃ, না—না—
এসব ঠিক নয়, ভুল ;

যেই মাত্র ছুঁয়েছে কেউ, হেঁট হয়ে
পথের ধুলোয়-ধুলোময় তোমারই 'বুড়ো আঙুল॥'

বার্ণিক রায়

ছেড়ে যেতে হবে

ছেড়ে যেতে হবে—
খড়-কাটা মাঠের মতন পৃথিবী পড়ে থাকবে
নষ্ট নিওন-লাইটে দপ্‌দপ আলো জ্বলবে বুকে।

চারদিকে শ্যামল বনানী
বর্ষার নদীর জলে ঢেউ আকাশের মেঘে স্বপ্ন
পাখির ডানার মায়া ছায়া হয়ে দোলে
মাটির গভীরে, সূর্যের শিকড়ে
ঝোপের ভেতরে শুধু গান হয়ে বাজে সমস্ত ভুবন
রমণীর মুখে

তারপর অধিকার ভেঙে দেয় রূপ
ঘুমে জাগরণে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে হাঁটা ও বসায়
অমোঘ নিয়তি টেনে নেয় অতল খাদের গর্ভে
শরীরের চেতনায় শীতলতা মেখে বেনো বুদ্বুদের মতো
কেবল অণুর পুঞ্জ ওঠে নামে, কারো কোনো
ক্ষতি নেই, লাভ নেই
রক্তের ভেতরে ধ্বনিময় গানের অণুর সুর কথা বলে
মৃত্যু এসে পাশে বসে, তাকে দেখতে পাই না—

দাউদ হায়দার

একা, এই শ্রাবণে

তারপর আমি অনেকক্ষণ বসেছিলাম। অন্ধকার নেমে এলো আমার
চোখের সামনে—শরীরে বাহুতে দীর্ঘচুলে
 লেপটে গেল সেই কালিমা—
এক সময় চোখ তুলে দেখলাম, কয়েকটি নিঃসঙ্গ নক্ষত্র আকাশে অসহায়
ফুটে আছে। আমি অভ্যাসবশতঃ তারাদের আর আমার
দূরত্ব নির্ণয় করতে প্রস্তুত হলাম!

হঠাৎ মনে পড়লো সেই শ্রাবণের কথা। আমি তোমাকে সেদিন
প্রথম ভালোবেসে ভালোবাসার একটি যতিচিহ্ন এঁকেছিলুম, ওষ্ঠে
কাঁপা কাঁপা অনুনয়ে। সেই আমার প্রথম প্রেম সেই আমার চুম্বন!
—চুম্বন এবং প্রেমের মধ্যে লুকানো

পরবর্তী বিচ্ছেদের ইতিহাস!

আমি, আজ এই শ্রাবণে একা, পরবাসী। অন্ধকার বাতাস ও
কয়েকটি নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিচ্ছিন্ন মানুষ!

গোকুলেশ্বর ঘোষ

অনিশ্চিত অন্ধকার

ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু ফেরা হলো না
 চিঠিপত্রে আদান প্রদান বন্ধ হলো;

স্বার্থের সংঘাতে ঘর গুছোতে ব্যস্ত
যে যার মত নৈপুণ্যে দূরত্ব রেখে যাচ্ছি,
যত সময় যাচ্ছে, তত দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে……

পিছনে হেঁটে যাচ্ছি……বার্ধক্য থেকে শৈশব
অন্ধকার ধাক্কা দিচ্ছে কনুই
কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,
না নিজেকে, না অন্যকে—
এমন করে যেতে যেতে—
কোথায় যাচ্ছি দেখবার নির্দেশ নেই
কেউ কাউকে চিনি না অন্ধকারে।

করমর্দনের সৌখীনতা থাকলেও
এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করা যায় না,
প্রাণের মধ্যে আকুলি বিকুলি করলেও
মধ্যস্থ এসে বাধা দেয়
চারিদিকে শোকাচ্ছন্ন আবহাওয়া—
আমার চোখের পর্দায়
এক আকস্মিক অচেনা
অন্তহীন সময় অনিশ্চিত অন্ধকারে ঝুলে পড়ে

ক্ষিতীশ দেব সিকদার

বিভ্রম

বুকের পাশে বাস্তবিকই
বাবুই পাখির বাসা ছিল—তুমি কেবল

মুখই দেখলে
তুমি কেবল চোখই দেখলে
বুকের পাশটা এড়িয়ে গেছ !

এবার এসো বাবুই পাখির ভাঙা বাসায় !

পিনাকেশ সরকার

ফেরার টিকিট

আসার আগেই ফেরার টিকিট কাটতে জানাও
টেলিগ্রামে
দূরপাল্লার নীল বাতাসে শব্দডিঙি
মধ্যযামে ।
হাতপাখা চুপ অন্ধকারে ভাসছে রুমাল
বুদ্ধিনাশা
দীর্ঘপ্রাচীন অগ্নিবালক ঠাণ্ডামুখেই
খেলছে পাশা ।
গোলাপবালা, সোহাগচারু বুলবুলিটি
মাঝবোশেখে
তোমার নিটোল রক্ত কপোল ছাড়িয়ে কঠিন
কী কৌতুকে
ধান খুঁটে খায় শুকনো রোদে···বাসনঅলার
ক্লান্ত কাঁসি
যায় বেজে যায় রুটিনমাফিক—বুকের ভেতর
ঝিকুট হাসি ।

পোষমানানো গ্রীষ্মে-শীতে পোষমানা সব

ছন্দ উপায়

ফেরার টিকিট আসার আগেই···তোমার জন্যে

এইটুকু দায়।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

উড়িয়ে দিও ভালবাসা

তেমন দিনে ভালবাসা উড়িয়ে দিও
উড়িয়ে দিও প্রেমের নানান উত্তরীয়
গাছের ডালে উড়িয়ে দিও নক্‌শা করা
এতকালের স্বপ্নে দেখা রমণীয়—
তুমি আমায় শিক্ষা দিলে দুঃখ পাওয়া ভালবাসা
মরা নদীর বুকের ভিতর থাকতে পারে তীব্র নেশা
মাতাল হওয়া সয় না ধাতে
শহর জুড়ে অনেক মাতাল
বরং আমি তোমার জন্য ভাবতে পারি আকাশ পাতাল।
আনন্দহীন দিবস যাপন
দুঃখে থাকা আমার প্রিয়
রহস্যময় মানুষ আছে, কষ্ট যাদের সহনীয়॥

শরৎসুনীল নন্দী

পাঁজরের মধ্যে এক তাপ

আগুন ফুরোলে শিখা তবু
জ্বলে অলক্ষ্যেই
যায় দিন নদীর জলের মতো যায়

জলের মতোই ভিজে মাটির মতোই সিক্ত দিন
যায় দিন নদীর প্রবাহে চলে যায়,
নদীর চরায় বেনাঘাস ঘাসের শিকড়ে ভবিষ্যৎ
ঘুমোয় নদীর জলে মাছ মাছের বুকের মধ্যে রাত
যায় রাত আগুনের তাতে তপ্ত রাত
কাছেই গাছের ডালে ভোর
শিশিরে ভিজেছে বেনাঘাস
জলতে থাকে
পাঁজরের মধ্যে এক তাপ।

কবিরুল ইসলাম

ঈশ্বরের মতো

ছিলে কবিতার ঘুণ হাড়হদ্দ চিনে
ঈশ্বরের মতো তুলে অদৃশ্য আঙুল
পদ্যের প্রতিমা তারা যেন স্বয়ম্বরে
নাটকে নভেলে নয় কবিতার ঋণে
ডুব সাঁতারে আপাদমস্তক সসাগরা

যে যেমন এসে যায় প্রস্তুত এবং
অপ্রস্তুত। লক্ষ্যভেদে সোনার মৌমাছি
কিংবদন্তী কৌটো খুলে ঢেলে দাও রং
চিত্র ও সঙ্গীতে গুলে।

বলো, আমি আছি
আমারও বাগান আছে বাগানের মতো
ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ আছে সদরে অন্দরে॥

শান্তা চক্রবর্তী

দক্ষিণের দিকে

কোন কোন সময়, দিন কিংবা রাত তা যতই অল্প হোক,
হৃদয়কে অনায়াসে দ্রব করে ফেলে।
কোন কোন ব্যক্তি, সে যুবাই হোক প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ—
তাকে দেখলে শ্রদ্ধা কেমন জল হয়ে যায়!
সারাটা জীবন ধরে আমি এমন সময় বা ব্যক্তি খুঁজেছি।
সমুদ্রে
    আকাশে
        মাটিতে
            আর মনের ভিতরে।
পরিশ্রান্ত হয়ে পশ্চিমের জানালায় জানু ভেঙে বসি।
চোখের জমিতে অন্ধকার, সব জল শুকিয়ে গিয়েছে।
সেই সময় সেই ব্যক্তি এসে নাকি, কে জানে কখন,
ফিরে চলে গেছে দক্ষিণের দিকে।

আশিস সেনগুপ্ত

টেবিলের উপর থেকে পিনকুশান উধাও

টেবিলের উপর থেকে পিনকুশান উধাও…ঘুমের ব্যাঘাত
রোদ-বৃষ্টি—ঘুড়ি ওড়ে কোথায়, লাটাই বেয়ে ছাদে সুতো…
মণ্ডপের সামনে জল জমেছে, ইকৃরি মিকৃরি পুঁতির মালা

ডিম ছেড়েছে সোনাব্যাঙ, কচুবনের পাশ দিয়ে
তিন-চোখা মেজাজি থুরকিনা, তার পেছনে পেছনে
সবে ইঁদুরে দাঁতখসা মাড়ি, স্বপ্নমাখা অলৌকিক
অতল গভীর কুচকুচে কালো চোখ পদ্মদীঘি থেকে
ঝাঁঝি তুলে এনেছে, শামুক গুগলি, গায়ে মিষ্টি গন্ধ এখনো ;
ভোঁকাট্টার হল্লা শুনে ভাঙবে হয়তো দুপুরের ঘুম
অভিভাবকত্বের ছড়ি কি দাড়িপাল্লা নাকি হে···?
বুকের মধ্যে কে ঘুড়িটা লটকাচ্ছে, চিংড়িমাছের দাঁড়,
কামরাঙা আতাগাছের ভেজা পাতা থেকে টুস্‌টুস্‌ জল
বিষণ্ণ খালের বুকে পায়ে বৈঠা পেঁচিয়ে সোনাই মাঝির গান
ঘোলা জল উথাল পাথল···

অমরনাথ বসু

ক্রমশ শীত

নিরন্ধ্র পোষাক ফুঁড়ে শরীরে ক্রমশ জমছে শীত
 সহসা সাগরের বাতাস ধুলো উড়িয়ে গেল
 হিমঝরা আকাশের তলায়
এই ঠাণ্ডা ঋতুর কনকনে শাসনকালে এখনো আমি মুগ্ধ হবো
 প্রদর্শিত মৌসুমী ফুল ছেড়ে হাস্যমুখর রমণীদের সোৎসাহে
ক্রমশ জমছে শীত
আহা কি সৌভাগ্য আমার
এই ভালবাসার ঘাসের শিশিরে হাঁটতে হাঁটতে সন্ধান করি
 ইহজন্মের পরিত্রাণ

চার পাশে শীতের গন্ধ কুয়াশা ভেঙ্গে আলোর সারি
ফুটপাথের ভিখারী শিশুটির ঘুম ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালে
যেন বা বোঝাতে চায় শীত এই জন্মেরই
নীরন্ধ্র পোষাক ফুঁড়ে শরীরে ক্রমশ জমছে শীত
নিয়মের নিয়তি বুঝতে বুঝতে বড় বেশি ভাল লাগে
শীত প্রাণের গনগনে উনুনটা
তবু কেন…এই শীত পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে নেই কেউ
টের পাই শীতকাতুরে মানুষ মানুষী খুশীর চেয়ে
দুঃখেই বড় বেশি কাতর
অথচ শীত বড় গভীর আশ্চর্যে দ্রুত তার আয়ু কেন যে ফুরায়… !

চিত্ত ঘোষ

করতলে অন্ধকার

করতলে অন্ধকার
সে মুখমণ্ডল
আচ্ছন্ন আবৃত করে
তার
প্রতিবিম্ব নাই।

আমার ছায়ার সঙ্গে আমি হেঁটে যাই
রৌদ্রে অন্ধকারে

আচ্ছন্ন আবৃত এক প্রতিবিম্ব, একা।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আঘাতের নাম সুন্দরী

সৌন্দর্য নয়, আঘাত—
আঘাতের নাম সুন্দরী।

যা-কিছু মানুষের মধ্যে এক যে-কেউ অহঙ্কার
সেই একমাত্র পুরুষ; পুতুলের মধ্যে নয়
গর্জনের মধ্যেই সিংহ, একমাত্র সিংহ;
অবয়ব তাঁবু ফেলেছে আত্মার মধ্যে এবং।
সারাংশের মধ্যেই সংসার

কি-কি-নারীর মধ্যে কে-কে-সুন্দরী।
মানচিত্রে বন্যার মধ্যেই নদী, প্রকৃত নদী
যেমন অগ্নিষ্টোমের মধ্যেই সব বৃষ্টি;
সৌন্দর্য ডুবে আছে তোমাতে
তোমার হাতে প্রহরণ এবং আঘাত।

যা জ্বলে না তা ফলে না
আলিঙ্গনের বন্ধনী ভেঙে
স্তম্ভিতের মধ্যে দাউদাউ নিশুতি প্রহর আমরা
দিনের গা থেকে তীক্ষ্ণমুখ সূঁচগুলি খুলে নাও
সূর্য নিভে যাবে।
আমরা পরস্পরকে নিভাবো না।

সৌন্দর্য নয়, আঘাত—
আঘাতের নাম সুন্দরী

গোপাল ভৌমিক

স্মৃতিরা প্রাচীর শুধু

স্মৃতিরা প্রাচীর শুধু
কারাগারে বন্দী আমি একা ;
অনেক বছর পরে
ছাড়া পেয়ে ভয় করে ঘরে ফিরে যেতে
কে জানে সেখানে কত
ভাঙচুর হয়ে গেছে সময়ের স্রোতে
কারা আছে কারা নেই
দৃশ্যপটে এসেছে কে অজানা নতুন।

বাস্তবের মুখোমুখী
না হবার চিরন্তন সেই ভয় শুধু
আমাকে বিব্রত করে
পরিচিত পরিবেশে ঘোরায় কেবল
যা-কিছু অতীতে ছিল
তার সব সৌরভ নির্যাস
ভেসে এসে বর্তমানে স্মরণ করায়
স্মৃতিরা প্রাচীর শুধু।

আনন্দ বাগচী

ঘণ্টা দেয় শূন্য ইষ্টিশন

চোখের স্ফটিকজলে সব মূর্তি নিরঞ্জনে যায়।
আয়নার পিছল বুকে ফস্কে যায়
মানুষের নগ্ন নির্জনতা,
পঞ্জিকার লগ্ন অঙ্ক, ক্ষণিকের খেলাচ্ছলে, আয়ু

কোথাও থাকে না কেউ, ফেরারী বয়স, ছুটি
ঘণ্টা দেয় শূন্য ইষ্টিশন,
ফুলশয্যাশায়ী বধূ বৃদ্ধা আজ
হামাগুড়ি দিত যে শিশুটি
আজ তার জুলফি দেখে চমকে উঠি
বুকে বাজে আশ্বিনের ঢাক
কার্ণিসে নতুন শাড়ি অন্য পুরুষের গন্ধে কাঁপে
নির্মম ছুটির মত ট্রেনের হুইসল ছুটে যায়,

কোথাও থাকে না কেউ কাছে গেলে শুধু অন্য
পুরনো গলির মোড়ে দুইচোখ জল ভরে আসে ॥

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় চিন্তা

আজ আর কোথাও যাব না।
আমার নিজস্ব দুঃখ ঘিরে থাক
ছোট এই ঘর,
নিজস্ব গোপন অনুতাপে
পুড়ুক প্রহর।
অন্য দিকে হাত বাড়াব না।
জানি সব কিছু ছিল। সব।
অনায়াস শুশ্রূষা, সান্ত্বনা।
সমস্ত জানলায় আমি নিজে হাতে
তুলেছি অর্গল।
জেনে গেছি দ্বিতীয় চিন্তায়—
দ্বিধার আরেক নাম ছিল।
তিনবার বলিনি, তাই কোনো অনুভব
সত্য হয়ে ফুটে উঠল না।

ইউজেনিও মন্তালে : ইতালায় কবির স্বীকৃতি

সাহিত্যে ১৯৭৫ সালের নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো ইতলীয় কবি ইউজেনিও মন্তালেকে। আমাদের কাছে এই নামটি প্রায় অপরিচিত। তাছাড়া তিনি আজ প্রায় দু'দশক আগেই কাব্য চর্চা বন্ধ করে দিয়েছেন।

১৮৯৬ সালে জেনোয়াতে ইউজেনিও মন্তালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীতের চর্চায় তন্ময়। তখন ইতালীর সর্বত্র বয়ে চলেছে এক নিরুদ্বিগ্ন জীবনের প্রবাহ। এরই মধ্যে হঠাৎ ১৯১৪ সালের ভয়াবহ যুদ্ধের ছায়া নেমে এলো। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যেন কেঁপে উঠলো। আঠারো বছরের ইউজেনিওকে স্কুলের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই সেনা বিভাগে ভর্তি হতে হলো। বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গীতের সাধনা। স্তব্ধ হয়ে গেল নিজের স্বরধ্বনির চর্চা।

তারপর একদিন মহাযুদ্ধ শেষ হলো! কিন্তু তখনো ইউজেনিওর মন জুড়ে রয়েছে যুদ্ধের আতঙ্ক আর বিভীষিকার স্মৃতি। তিনি তখনো কোন রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তার পরিণতি স্বরূপ তাঁকে দশ বছরের হতাশায় বেকারী জীবন অতিবাহিত করতে হয়। অবশেষে একদিন 'দৈনিক মিলানীজ'-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। সম্পাদকের অবশ্য একান্ত ইচ্ছে ছিল পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব যেন ইউজেনিও মন্তালেই গ্রহণ করেন। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও মন্তালেকে সংবাদদাতা হিসেবে বিদেশে পাঠানোর আর কোন সম্ভাবনা রইলো না। এর মধ্যে তিনি লিখে চলেছেন—কি? কি সেই লেখা? না, ইউজেনিওর কোনদিনই

ঔপন্যাসিক হবার কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এমন কি তখন তাঁর পক্ষে কিছু আবিষ্কার করাও সম্ভব ছিল না। বরং সেখানে ধীরে ধীরে নিজেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বা সমালোচনার এক অনুরাগী পাঠক হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। তিনি অনুভব করতেন তাঁর মধ্যে রয়েছে লিগুরিয়ানদের সহজাত রসিকতা। জেনোয়ায় তিরিশটি বছর কাটানোর অবকাশ মুহূর্তে তাঁর ভাবনায় বিরাজ করত নিজের সম্বন্ধে বা নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু রচনা করা। অবশ্য সেই রচনা যেন কোন মুহূর্তের জন্যেও পাঠকদের মধ্যে বিরক্তি সঞ্চার না করে। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তিনি একজন সাধারণ লোকের জীবনী বলে যাবেন, যে মানুষ সর্বদাই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যাবে।

এই সব ভাবনা থেকেই একদিন তাঁর বিখ্যাত গল্পগুচ্ছ 'দি বাটার-ফ্লাই অব দিনার্দ' প্রকাশিত হয়। গুচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কতিপয় গল্পের অন্তরালে লিগুরিয়ার উপস্থিতি থাকলেও অধিকাংশ রচনার পটভূমিকায় অবস্থান করবে বিখ্যাত ফ্লোরেন্স নগরী। কারণ এখানে এক ইংরেজ পত্নীর সঙ্গে নিজেকে কুড়িটি বছর ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত করে রাখেন। ফ্লোরেন্স বাস করতেন ইতালীয় হিসেবে। তখন প্রায়ই তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তেন। স্থানীয় অসন্তোষ এবং বিবাদ থেকে প্রায় একজন বিদেশীর মত নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই ভালবাসতেন। এখানে তাঁর নিরলস সংগ্রাম একদিন ব্যর্থ হয়। তিনি তখন ব্যবসার কেন্দ্র মিলানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তাঁকে বলতে শুনি 'আমার মধ্যে রয়েছে সারিসারি স্মৃতি। যার একান্ত তাগিদে একদিন আমাকে লেখার দিকে হাত বাড়াতে হলো। সত্যি এই ধরনের দুরন্ত আবেগ আমাকে যেন লেখার জন্যে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করতে সুরু করলো।'

১৯২২ সালে ইউজেনিও মন্তালে 'প্রিমো তেম্পো' নামক এক সাহিত্যপত্রের প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৭-২৮ সালে ইতালীয় বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা 'বেম্পোরাদে'র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। ১৯২৯-৩৮ সালে গ্যাবিনেত্তো ভিউসেক গ্রন্থাগারের অধিকারিক

হিসেবে কাজ করেন। তখন অবশ্য নিয়মিত ভাবে 'লা ফিয়েরা লেওরিয়া'র কাব্যসমালোচক হিসেবে যোগদান করেন। তাছাড়া 'কোরিয়ের দেল্লা সেবার' সঙ্গীতের সম্পাদনায় দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিলেন।

ইউজেনিও মন্তালের কাব্যচর্চায় যা প্রত্যাশা করা যায়, তা হলো তিনি সেখানে আবেগ এবং নিজস্ব গভীর অনুভূতিকে একীভূত করে স্ফটিক সৃষ্টি করেছেন। সেই উজ্জ্বল স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই বিশ্বের নির্দয়তা, যা পরিহার করে চলা প্রায় কষ্টকর। তার ছাড়া মন্তালেকে অন্য এক রূপে দেখা যায়। দুটো বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী-কালীন অবকাশের সময় নিজেকে প্রত্যক্ষ করেন অস্তিত্ববাদ সংক্রান্ত সঙ্কটের জগতে। সেই সঙ্কটের বিস্তৃত ছায়া শুধুমাত্র ইতালীয় কবি মন্তালের কাব্যেই পড়ে নি, পড়েছে ইংরেজ কবি এলিয়েটের কাব্যেও। ইউজেনিও মন্তালের প্রথম পর্যায়ের কবিতা অবশ্য হারমেটিক্ বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। সেই কাব্যে তিনি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা সুরু করেছেন, যার অনিবার্য পরিণতিতে নিজস্ব প্রবর্তিত বাক্য গঠন বিন্যাস, শব্দসূচী এবং বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ রচনাশৈলী সহজ আবেগে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়েছে।

মন্তালের সমগ্র কাব্যে যা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরেছে তা হলো দান্তে, লিওপার্দি, পাসকল্লি, দ্যা আনুন্‌ৎসিও এবং গোস্‌সানোর কাব্যের ব্যঞ্জনায়। মন্তালে এখানে ভাষাগত দিক থেকে শব্দকে মুক্তি দান করেন। এবং বিবর্তনে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। অবশ্য কাব্যে এই ধরণের ভাষার ক্রমবিবর্তনকে এলিয়ট বলেছেন— শব্দ এবং অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যের এক অসহনীয় সংগ্রাম। মন্তালে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু শব্দের পুনর্বাচন নিয়ে কাব্যিক অনুভূতিকে সত্তায় মিশিয়ে দেন। তার ফলে দেখা যায় যে রচনশৈলীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে ওয়র্ডসওয়র্থ এবং এলিয়ট যে দায়িত্ব পালন করেছেন মন্তালে নিজেকে সেখানে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন।

১৯২৫ সালে ইউজেনিও মন্তালের প্রথম কাব্য এই 'ওস্‌সি দি

সেপ্পিয়া' প্রকাশিত হয়েই সাড়া জাগাতে সক্ষমতা লাভ করে। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনত্রিশ। কবি হিসাবে তিনি তখন স্বীকৃতি লাভ করেন। এই কাব্যগুচ্ছের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের একান্ত অপরিহার্য ঋণাত্মক শব্দ ও বাক্য বা তার গঠন পদ্ধতি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতালীর নৈসর্গিক চিত্র, একদা ছোটবেলার ছোট্ট ছোট্ট নানা ঘটনায় সমৃদ্ধ লিগুরিয়ার দিনগুলোর স্মৃতি। যদিও তা কাব্যের প্রয়োজনে কবির ধারণায় শুধুমাত্র পটভূমি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কাব্যে মূল বিষয়গুলোর মধ্যে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে স্মৃতি, মৃত্যু এবং অনন্তকালের সঙ্গে যুক্ত এক অবিনশ্বর সার্বভৌম পুনরাবৃত্তিহীনতা। তাছাড়াও প্রত্যক্ষ করা যায় মহাকালের অভিপ্রয়াণে পরিবর্তন অথবা বিনষ্টি যেন মানবিক সম্পর্কের অন্তরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'লে ওকেস' ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে গভীর ভাবপ্রবণতা। অনুসন্ধান পর্যায়ের সর্বত্র ঘূর্ণিত হয়েছে অতীত ও বর্তমান, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, স্মৃতি কামনা, কামনা ও বাস্তব। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির সহজাত অন্তঃপ্রকৃতির বিশেষ অংশ, আত্মবাদী ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব এবং বহির্বিশ্ব যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আবেগে যুক্ত হতে দেখা যায় এক নারীকে।

তৃতীয় কাব্যগুচ্ছ 'ফিনিস্তারে' ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগুচ্ছে ছড়িয়ে রয়েছে সভ্যতা এবং ধ্বংসের সীমান্ত প্রদেশ। সেই সঙ্গে দাসত্ব এবং মুক্তির মধ্যে মৃত্যুলব্ধ জীবন এবং আত্মার মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক। সেখানে এক নাটক অভিনীত হয়েছে। কবি তখন দর্শক হিসাবে স্থির থাকেন নি বরং অভিনেতা হিসাবেও তিনি তাঁর যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ কবি যে তখন এক ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটের জগতে বাস করছেন। চারিদিকে রয়েছে ভূমিকম্প প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং উন্মত্ত বন্যার শিকার হিসেবে স্থির হয়ে রয়েছে সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং অসহায় মানুষ। এই কাব্যগ্রন্থে প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম

হিসেবে নায়িকাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নায়ক নেই। এই ঘোরতর দুর্যোগের অন্ধকারে যখন নায়িকা ইউরিডিসি ভূমিতলে প্রায় অদৃশ্যমানা তখন এ পৃথিবীর কোন ওরফিউসের পক্ষে তাকে কিছুক্ষণের জন্যেও ধরে রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি।

মন্‌তালের উল্লেখযোগ্য এবং সর্বশেষ গ্রন্থ 'লা বুফেরা ই আলত্রো' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় এক নতুন ধরণের কাব্যিক মেজাজ। যা অনুভূতির সঙ্গে মিশে রয়েছে। প্রেমের উপলব্ধি ঘটেছে প্রত্যক্ষ ভাবে। তা ছাড়া প্রকাশভঙ্গির নিখুঁত প্রয়োগও লক্ষ্যণীয়। মন্‌তালে আধুনিক মানুষকে নাটকের আয়তনের মধ্যে ধরে রেখেছেন। এখানে মানুষ সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জীবন চালাতে অসমর্থ। তার পরিবর্তে মহাকালের অন্তর্গত দিন মাস বছরের গণ্ডীর বাইরে যে অনুষ্ঠিত ঘটনা বা পরিস্থিতি সেখানে সে মর্মান্তিকভাবে পরিচালিত এক অসহায় অস্তিত্বমাত্র। কবি মন্‌তালে তখন গভীরভাবে অনুভব করেন এক দেহাতীত স্বপ্নশরীর এবং অন্য এক মোহিনী শক্তি। উপলব্ধি করেন মানুষ এবং বস্তুর মধ্যে অবস্থান করছে এক প্রকার সম্পর্ক। মানুষ এখানে তার ভাগ্য বা নিয়তি সম্বন্ধে যে এক অজ্ঞতার দুর্গম কারাগারে নিজেই বন্দী হয়ে অবস্থান করছে। প্রসঙ্গতঃ অনেকেই মন্‌তালেকে দুঃখবাদী কবি বলেও চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য আলোচিত কাব্যগুচ্ছে হতাশার উপলব্ধি যেন বারবার উচ্চারিত হয়েছে। তাই মন্‌তালকে অনেক সময় মনে হয় এ শতাব্দীর লিওপার্দি।

কাব্যগ্রন্থ ছাড়া তিনি মধ্যে মধ্যে রচনা করেছেন সার্থক গদ্য: যেমন ১৯৪৬—১৯৫০ সালের মধ্যে বিভিন্ন গদ্য রচনার একমাত্র সংকলন হলো 'ফারফাল্লা দি দিনার্দ'। ইংরেজী অনুবাদ 'দি বাটারফ্লাই অব দিনার্দ'। এই গল্পগুচ্ছে, অবশ্য কবি মন্‌তালে নিজেকে এক উল্লেখযোগ্য গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসেবে পাঠক মহলে পরিচিত করেছেন। বিভিন্ন গল্পে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনী-সংক্রান্ত স্মৃতিচারণা। চরিত্রের নানা ভঙ্গীর রেখাচিত্র, ভ্রমণের মানসিকতা প্রভৃতি। প্রসঙ্গতঃ ইউজেনিও

মন্তালের কাব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধির জন্যে একান্ত প্রয়োজন সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ তাঁর গদ্য রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বিশেষ করে গদ্য রচনায় যে একান্ত প্রিয় পরিবেশ, প্রতীক এবং ব্যবহৃত মায়াময় বা মোহনীয় শব্দাবলী এবং শব্দরূপদ প্রত্যক্ষ করা উচিত।

মন্তালের কাব্যগ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতীকের মধ্যে সমুদ্র এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। কারণ তাঁর অন্তরঙ্গ বাল্য কৈশোর কেটেছে লিগুরিয়ান উপকূলের সান্নিধ্যে। সমগ্র চেতনায় ধীরে ধীরে কখন যেন সামনের মহাসমুদ্রের তরঙ্গ; বিশালতা কোথায় তলিয়ে নিয়ে যেত। পরবর্তীকালে সেই সমুদ্র তাঁর কাব্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বসে। সেই সঙ্গে অসীম বৈচিত্র্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের পটভূমিকে সমৃদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া মন্তালের কাব্যের মূল বিষয়ের মধ্যে যা প্রধান তা হলো মৃত্যু, স্মৃতি এবং ভালোবাসা, যা তার কাব্যকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে রেখেছে। এখানে অবশ্য কোন একজন ইংরেজ কবির মৃত্যুর উপলব্ধির সঙ্গে মন্তালের ধারণাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন টমাস হার্ডির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। হার্ডি এবং মন্তালে উভয়ের ক্ষেত্রেই যা ছিলো বিশুদ্ধ এবং মৃত্যুর প্রতি মানবিক ধারণার নিয়ন্ত্রণ। মৃতের প্রতি ভাবপ্রবণতার আনুগত্য মূলতঃ ইচ্ছাশক্তি এবং স্মৃতির প্রচেষ্টামাত্র নয়, বরং তা হয়েছে প্রগাঢ়-ভাবে প্রকৃতি এবং মানবিক প্রবৃত্তিজাত।

কবি মন্তালে অবশ্য মৃতের পুনরুত্থানের জন্যে প্রার্থনা করেন না। কারণ এখানে তিনি স্থির নিশ্চিত নন যে এ ধরণের উপাসনায় কোন সাড়া মিলবে কি? তখন যেন তিনি নিবেদন করেন যে এ জীবনে যা কিছু অপূর্ণ তা যেন মৃত্যুর পরপারে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মন্তালেকে অনুবাদের জগতে নিজেকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে দেখা যায়। যেমন সেক্সপীয়র, টি এস এলিয়ট, হ্যারমান মেলভিল, ইউজেন ও'নীল এর একজন বিখ্যাত অনুবাদক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি ইতালীয়

কাব্যে এ যুগের এলিয়ট হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাছাড়া মন্‌তালের কাব্য জুড়ে যাদের অন্তরঙ্গ প্রভাব বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, স্ত্রী ড্রুসিল্লা এবং এক ইহুদী তরুণী।

ব্যবহারিক জীবনে তাঁর কাব্যের স্বীকৃতি হিসাবে ইতালীর সর্বোচ্চ সম্মানপদ 'সেনেটর' হিসেবে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। তাছাড়া জীবনের শেষ সীমায় এসে পেলেন পরম সম্মান নোবেল পুরস্কার।

পরিশেষে অবশ্য দেখা যায় মন্‌তালে ইতালীয় কবি লিওপাদি এবং ইংরেজ কবি এলিয়ট থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন জগৎবাসী। যেমন একদা ইংরেজ কবি ষ্টীফেন স্পেণ্ডার মন্‌তালে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন: "ইউজেনিও মন্‌তালে হলেন এই শতাব্দীর ইতালীয় জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি কখনো সীমাবদ্ধ পৃথিবী থেকে পলায়ন করেন নি। বরং অনিশ্চয়তাকে বরণ করে তাঁর অভিপ্রায় আবিষ্কারে তিনি অনুক্ষণ তৎপর।"

[একটি কবিতা]

দেয়ালে কুশ্রী অঙ্গীকার

দেয়ালের শ্রীহীন লিখন
ছায়াবৃত করে রাখে এলোমেলো অবস্থান ভূমি
আকাশের বক্রাকার অংশ তখন
উদ্ভাসিত।

কে আরও কিছুকাল স্মরণের কিনারে নিয়ে আসে যে
পাবক আবেগকে উজ্জ্বল করে
বিশ্বের মেজাজে শুষ্ক নীরবতা
ছায়াময় প্রতিমা ইতস্তত: নিক্ষিপ্ত,
আমি কাল আবার প্রত্যক্ষ করব জাহাজঘাট—
এবং দেয়াল এবং প্রাত্যহিক অভ্যস্ত জনপথ
কাল যা অধিগম্য হবে, শৈশবের
নোঙর যেন পড়ে উপসাগরে,
জাহাজেরই মতো।

বিজয় দেব

শচীন দেববর্মণ

শচীন দেববর্মণের মৃত্যুতে বাঙ্গালী এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাল। বস্তুতঃ শচীনদেব বাংলা সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাঙ্গালীর পোষাক পরিত্যাগ করেন নি। তাঁকে দেখা মাত্র তাঁকে বাঙ্গালী ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর বাঙ্গালীত্ব কেবলমাত্র বাইরের সাজপোষাকে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর অন্তর বাঙ্গালীর ভাবরসে পরিপূর্ণ ছিল। বংশানুক্রমে তিনি ছিলেন বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিপোষক। সকলেই জানেন শচীনদেব ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবারের সন্তান (প্রথম জীবনে তিনি কুমার শচীন দেববর্মণ নামেই পরিচিত ছিলেন, যদিও পরবর্তী জীবনে তিনি 'কুমার' শব্দটি নাম থেকে বাদ দেন যাতে সাধারণ বাঙ্গালীর সঙ্গে তাঁর প্রার্থক্য ঘুচে যায়)। ত্রিপুরা রাজ্য যখন বৃটিশ ভারত থেকে আলাদা ছিল সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা ছিল বাংলা। আজ ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য; কিন্তু সেখানকার সরকারী কাজের ভাষা আজ আর বাংলা নেই। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় বাঙ্গালীর জাতীয় ক্ষতির এ আর এক নিদর্শন। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাঙ্গালীদের নিজ বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গেও সরকারী কাজের ভাষা বাংলা হলেও এখনো প্রকৃত ব্যবহার হয় নি। স্বাধীনতা লাভের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরও যদি বাঙ্গালীরা সরকারী কাজে নিজ ভাষা ব্যবহারের পুরোপুরি অধিকার এবং সুযোগ লাভ করতে না পেরে থাকে তবে তার থেকেই অনুমান করে নেওয়া যায়

যে কতগুণ বেশি বাংলাভাষা প্রীতি থাকায় দরুণ ত্রিপুরার রাজা তৎকালীন শাসকবর্গের ভাষা ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে সাহসী এবং সক্ষম হয়েছিলেন। সেই রাজপরিবারের সন্তান শচীন দেববর্মণের পক্ষে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ধারক হওয়াই অবশ্য প্রত্যাশিত। শচীনদেব সে প্রত্যাশা সবদিক থেকে পূর্ণ করেছেন; উপরন্তু আরও কিছু বেশি দিয়েছেন। শচীন-দেবের জীবন সেই প্রত্যাশা পূরণের ইতিহাস।

বৃটিশযুগে কলিকাতা বাঙ্গালী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল এই যে কলকাতাই বাঙ্গালীর মুখ্য শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। যদিও বিংশ দশক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী ছিল ঢাকা শহর মাত্র। অবিভক্ত বাংলার আর সকল জেলার এবং একমাত্র ঢাকা শহর ব্যতীত ঢাকা জেলারও অন্য স্থানের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ওপরই নির্ভরশীল হতে হত। শিক্ষা এবং চাকুরীর জন্য বাঙ্গালীর কলকাতা আসা ছাড়া গতি ছিল না এবং অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কলকাতাতেই কাটাতে হত। সুতরাং কলকাতা সকল শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর জীবনের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল (অবশ্য একটি নগরীর উপর এই অতি-নির্ভরতার দরুন বাঙ্গালীকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে এবং অনেক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে—তবে সে আলোচনার স্থান অন্যত্র), শচীনদেবকেও ঐ একই কারণে কলকাতা আসতে হয়েছিল। লক্ষ্যণীয় হল কীরূপে শচীনদেব কলকাতা নগরীর নিকট পরিচিত হলেন। সকলেই জানেন সে পরিচয় ভাটিয়ালী গায়ক হিসাবে, পল্লীগীতির গায়ক হিসাবে। বাংলাদেশের যে অংশ শচীনদেবের জন্ম এবং শিক্ষাকাল অতিবাহিত হয়েছে সেই কুমিল্লা জেলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। গভীরতোয়া মেঘনা নদী এবং অজস্র খালবিল কুমিল্লা জেলার ওপর এক অপরূপ নক্সা সৃষ্টি করেছে। সেই জলপ্রধান অঞ্চলের গান ভাটিয়ালী। শচীনদেব তাঁর জন্মস্থানের সেই সংস্কৃতির পশরা নিয়ে

কলকাতার সমাজে উপস্থিত হলেন। শিক্ষিত বাংলার সঙ্গীত-জগতে লোকগীতির প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ এভাবেই পড়ে।

শিল্পরূপের বিবর্তনে লোকগীতি এবং লোকশিক্ষা একটি বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করলেও সমাজ কিন্তু সেই স্তরেই থেমে থাকে নি। শিল্পবিপ্লব, সমাজ-পরিবর্তন, শিক্ষার বিস্তার এবং তজ্জনিত মানসিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের শিল্পভাবনার প্রকাশের রীতি-নীতি ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের ফলে আধুনিক গান, রাগপ্রধান গান, কীর্তন, ঠুংরী, টপ্পা, খেয়াল ইত্যাদি রীতির প্রবর্তন ঘটেছে। শচীনদেব কলকাতা আসেন ত্রিশ দশকের গোড়ার দিকে। সেই সময় বাংলার সঙ্গীত-জগতে এক নবজাগরণের হিল্লোল দেখা দিয়েছে। তার আগে পর্যন্ত (রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের গান—যা কিনা তখন জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ পায় নি—বাদ দিয়ে) বাংলা গান ছিল সাধারণভাবে হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতের অনুকরণ—কথা ও সুরে। ত্রিশ দশকে বাংলাদেশে কয়েক-জন বিশেষ শক্তিশালী গীতিকার এবং সুরকার-এর আবির্ভাব ঘটে। গীতিকারদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য, (শচীন-দেবের জীবনে এঁর ভূমিকা বিশষ গুরুত্বপূর্ণ) প্রণব রায়, শৈলেন রায়, বাণীকুমার, সুবোধ পুরকায়স্থ, অনিল ভট্টাচার্য সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; সুরকারদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম, কৃষ্ণচন্দ্র দে, হিমাংশুকুমার দত্ত (শচীনদেবের শিল্পজীবনে এঁরও ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ), কমল দাশগুপ্ত, শৈলেশ কুমার দাশগুপ্ত, হীরেন বসু, পঙ্কজ-কুমার মল্লিকের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ত্রিশ দশকেই বাংলা আধুনিক গানের আবির্ভাব এবং প্রস্ফুটনের যুগ বলা যায়। যে কয়েকজন শিল্পী তাঁদের কণ্ঠস্বর দ্বারা বাংলা আধুনিক গানের বিকাশে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে অবশ্য নাম করতে হয় কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং পঙ্কজকুমার মল্লিক-এর। কিন্তু তারপরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি শচীন দেববর্মণ। কলকাতা আসার পর

পল্লীগীতির সঙ্গে সঙ্গে শচীনদেব আধুনিক কাব্যগীতি রেকর্ড করেন (আমাদের মত ব্যক্তির পক্ষে তাঁর রেকর্ডই শোনা সম্ভব হয়েছে, আসরে বসে তাঁর গান শোনার কোন সুযোগ ঘটে নি)। আধুনিক বাংলা গানের শব্দসম্পদ, সুরমাধুর্য এবং ছন্দ-ত্রয়ের যে অপূর্ব সম্ভার শচীন দেববর্মণ তাঁর কণ্ঠের মাধ্যমে আমাদের দিয়ে গিয়েছেন বোধ হয় আর কোন বাঙ্গালী শিল্পী তা পারেন নি। তাঁর গানের ভাষা সর্বকালের, সুর সর্বকালের।

শচীনদেব পল্লীগীতি গেয়ে জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেও সঙ্গীত-জগতের বৈচিত্র্যের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে রাগ সঙ্গীতের দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁর অন্যতম গুরু বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতগায়ক ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। শচীনদেবের মধ্যে বাংলার অকৃত্রিম সঙ্গীত ধারণার সংগে হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারের মিলন ঘটেছে। এই সম্মিলনের মূর্তরূপ তাঁর গাওয়া গান। পরবর্তী জীবনে শচীনদেব যখন সুরকার রূপে অববির্ভূত হ'ন তখন তাঁর সৃষ্ট সুরের মধ্যেও বাংলা গানের ঐতিহ্যের সংগে উত্তর ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের এই মিলনের সুফল দেখা যায়। তাঁর গাওয়া গান তাই খাঁটি বাংলা গান। আবার সেই সব গানের সুর যখন তিনি হিন্দী ভাষায় লেখা গানে প্রয়োগ করেছেন তখন সেই হিন্দী গানগুলি অবাঙ্গালী ভারতীয়দের মন সহজেই জয় করে নিতে পেরেছে। গানের ক্ষেত্রে শচীন দেববর্মণ বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিভূ; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি বাংলা গানের সুর হিন্দী গানে প্রযোগ করেছেন। (অবশ্য এক যুগ ছিল যখন ভারতীয় চিত্রজগতে বাঙ্গালী সুরকারদের প্রাধান্য ছিল এবং বাংলা গানের সুরই হিন্দী গানে দেওয়া হতো। আস্তে আস্তে তার পরিবর্তন ঘটেছে—আজ হিন্দী গান আবার বাংলা গানের আসরকে সংকুচিত করে দিয়েছে)।

শচীনদেব যখন তাঁর প্রতিভার মধ্যাহ্নে তখনই তাঁকে বাংলাদেশ, বাঙালী সমাজ ছেড়ে সুদূর বোম্বাই নগরীতে অপসংস্কৃতির বাহক

হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করতে হল। এই ঘটনার মধ্যে বাঙালী সমাজ এবং সংস্কৃতির অবক্ষয়ের সবিশেষ প্রকাশ। বাঙালী সমাজ আর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের লালন-পালন করতে পারছে না—তাই সারি সারি শিল্পী বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সমাজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছেন। এও এক ধরনের brain drain যা বহুদিন যাবত চলে আসছে অথচ যে সম্পর্কে বাঙ্গালীদের মধ্যে কোনই সচেতনতা নেই। মনে রাখতে হবে যে কোন সমাজেই শিল্পীর সংখ্যা উদ্বৃত্ত হয় না। ভারতবর্ষ অনুন্নত দেশ, তার মধ্যে বাংলাদেশ আরও অনুন্নত—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং সহস্র হাহাকারে ভারাক্রান্ত বাঙ্গালী সমাজের পক্ষে উদ্বৃত্ত সংখ্যায় শিল্পী-লেখক সৃষ্টি অসম্ভব। সুতরাং যদি কোন বাঙ্গালী লেখক, বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী জীবনের মধ্যাহ্নে বাংলাদেশ, বাঙ্গালী সমাজ ছেড়ে যান তবে সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি। প্রতিভার এ ধরনের বহির্গমন জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় উন্নত দেশগুলির পক্ষেও সহ্য করা ক্ষতিকর—বাঙ্গালীদের ক্ষতি সহস্রগুণ বেশি। একটা উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। কল্পনা করা যাক রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় রচনা না করে অন্য কোন ভাষায় তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশ করেছেন! শচীন দেববর্মণও যদি জীবনের ত্রিশ বৎসর যাবত হিন্দী সঙ্গীত-জগতের সেবা না করে বাংলা সঙ্গীত-জগতের পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকতেন তবে বাংলা সঙ্গীত-জগত যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ হত এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে কি? এবং তা না হওয়ায় যে বাংলা সঙ্গীত-জগত এক মহান স্রষ্টার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে বিষয়েও কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? পাঠান নেতা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা, সীমান্তগান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খান তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর মাতৃভাষা পুশতু ভাষার অনুন্নত অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন যে ভাষার সমৃদ্ধি তখনই হতে পারে যখন সেই ভাষার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ আপন মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করে। তা না করায় ভাষার শক্তি এবং সৌন্দর্য ক্ষীয়মাণ হয়ে রয়েছে। আজ বাঙ্গালী অবাঙ্গালী

প্রতিভাকে তো আকর্ষণ করতেই পারছে না, নিজেদের মধ্যে যারা প্রতিভাধর রয়েছেন তাঁদেরও ধরে রাখতে পারছে না। শচীন দেববর্মণ বাঙ্গালী জীবনের এই ট্র্যাজিডির প্রতিমূর্তি।

শচীনদেবের মৃত্যুতে অবাঙ্গালী সমাজ যেমন উদ্বেল হয়েছে, যুব সমাজ তা হয় নি। কারণ শচীনদেব যখন বাংলা গান করা বন্ধ করেছেন তার পরেই এই যুব সমাজের জন্ম। বাঙ্গালীদের মধ্যে গায়ক এবং সুরস্রষ্টা হিসাবে শচীনদেবের গুণগ্রাহী যারা তাঁরা সকলেই চল্লিশ পার হয়েছেন। অনেক বাঙ্গালী যুবক যুবতী শচীনদেবের সুর দেওয়া হিন্দী গান জানেন, কিন্তু তাঁর মূল বাংলা গান হয়তো কখনও তাঁরা শোনেনও নি। অর্থাৎ বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে বাংলা গায়ক এবং শিল্পী হিসাবে শচীন দেববর্মণ বহু পূর্বেই মৃত রূপে গণ্য হয়েছিলেন। বাংলার অন্যতম গায়ক এবং সুরস্রষ্টার জীবনে এর থেকে করুণ ট্র্যাজিডি আর কি হতে পারে! এ ট্র্যাজিডি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে কেবল শচীন দেববর্মণের নয়। এ ট্র্যাজিডি বাংলা গানের, বাঙ্গালী জাতির। আজ ভারতে বাংলা সংস্কৃতি ও সঙ্গীতের পশ্চাদপসরণের যুগ, আজ খোদ কলকাতায় যত অ-বাংলা গান হয়, বাংলা গান বোধ হয় তত হয় না (অন্য রাজ্যে বাংলা গানের কথা তো বাদই দিলাম)! তার কারণ রেডিও, রেকর্ড কোম্পানী এবং টেলিভিশনের ওপর বাঙ্গালীদের কোন অধিকার নেই। বিবিধ ভারতীতে কয়েক বৎসর পূর্বেও বোম্বাই নগরীতে প্রত্যহ বাংলা গান শোনার সুযোগ ছিল; আজ তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অথচ বোম্বাই বিবিধ ভারতীতে হিন্দী ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত এখনও নিয়মিত প্রতিদিন প্রচারিত হয়। অর্থাৎ বাংলা গান প্রচারের মাধ্যম ক্রমশই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

শচীন দেববর্মণের শিল্পী জীবনের সব থেকে বড় ট্র্যাজিডির প্রকাশ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে। অবাঙ্গালীরা সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে এবং মৌখিক কথোপকথনে শচীনদেবকে কেবল হিন্দী চিত্রের একজন সুরকার হিসাবেই বর্ণনা করেছেন!

তাঁর গায়কসত্তার কথা যে তাঁদের মধ্যে কেউ জানতেন তার কোন পরিচয় এই সকল শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে পাওয়া যায় নি। জীবিত-কালে যদি শচীনদেবকে বলা হতো যে তিনি কেবল হিন্দী চিত্র-গীতির সুরকার হিসাবেই গণনীয় তবে কি তিনি তাতে সন্তুষ্ট হতে পারতেন? কেন এরকম হল? কেন শচীনদেবের গায়কসত্তা এ ভাবে অস্বীকৃত হল? তার কারণ তাঁর শ্রেষ্ঠ গানগুলি বাংলায় গাওয়া—যে গানের সঙ্গে বাঙ্গালী যুবসমাজের ও হিন্দী ছায়াচিত্র প্রেমীদের পরিচয় নেই। দ্বিতীয় কারণ, ভারত রাজনৈতিক বিচারে এক রাষ্ট্র হলেও আসলে এক মহাদেশ—যেখানে এক ভাষার সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীদের পরিচয় সামান্য। তৃতীয় কারণ, বাঙ্গালী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি থেকে তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত হওয়ায় সাংস্কৃতিক দিকেও ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্পর্কে বিত্তবান বাঙ্গালীদের এবং অবাঙ্গালীদের উদাসীনতা বেড়েই চলেছে। অবশ্য আর একটি কারণ মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি-কর। একটা উদাহরণ দিলে একথা বোঝান সহজ হবে।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমার্ধের কোন দিনে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় "জে. এস." (J. S.) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে যুবকদের আহ্বান জানান হয়েছে "জে. এস." কেনার জন্য, শুধু এই কারণে যে ঐ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বিশেষ বিশেষ চিত্রতারকাদের বিশেষ ধরণের ফটো থাকবে। নারীদেহের লোভ দেখিয়ে পত্রিকা চালানো এবং বিক্রী করা আজ আর দূষণীয় নয়। আরও বহু বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র এভাবেই তাদের বিক্রয় সংখ্যা বাড়িয়ে চলছেন! আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে নারীদেরও এ বিষয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে দেখা যায় নি; বরং যেন মনে হয় তাঁরা অনেকে নিজেদের সর্বসমক্ষে আর একটু বেশি অনাবৃত করতে পারলে খুশি হতেন! বস্তুত তা যদি না হোত তবে বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে এ ধরণের বিজ্ঞাপনের ঘোরতর এবং ব্যাপক প্রতিবাদ ধ্বনি তোলা উচিত ছিল (কিন্তু এ প্রবন্ধ

লেখার সময় পর্যন্ত এ অশোভন বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা আমার দৃষ্টিতে পড়েনি)। যাই হোক, যা বলতে যাচ্ছিলাম। দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারের ফলে এমন একটা ধারণা আমাদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে উত্তরোত্তর দৃঢ় হচ্ছে যে সমাজে ছায়াচিত্র-তারকাদের মত শ্রেয় এবং প্রেয় আর কিছু নেই। তাই অর্ধশিক্ষিতা, কুরুচিসম্পন্না ছায়াচিত্রাভিনেত্রী বা অশিক্ষিত চিত্রতারকা যুবককে টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে উপস্থিত করা হয়—যে প্রচার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি হয়েও তাঁরা আমাদের দেশের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন থেকে পান না। পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। এই সিনেমা-কেন্দ্রিক মনোভাবের দরুনই অনেকের দৃষ্টিতেই শচীন দেববর্মণের জীবনের প্রথমার্ধ অগোচর থেকে গিয়েছে—কারণ তখন তিনি ছিলেন মুখ্যতঃ শিল্পী। জীবনের শেষার্ধে শিল্পী অপেক্ষা বেশি ছিলেন **organization man**। আজ সমাজে এই **organization man**-দেরই স্বীকৃতি বেশি; শিল্পীদের নয়। তাই শিল্পী, গায়ক, মনোহারী সুরস্রষ্টা শচীন দেববর্মণ যখন হিন্দী চলচ্চিত্রের অনেকগুলিরই সুর তাঁর আগের গাওয়া বাংলা গান থেকেই নিয়েছেন (কিন্তু **managed society**-এর স্তাবকবৃন্দের কাছে সে তথ্য অজ্ঞাত, জানা অপ্রয়োজনীয়), তখন সে-ইতিহাসের খোঁজ কেউ রাখেন না!

আশার কথা এই যে প্রকৃত শিল্পী তাঁর নিজ গুণেই জনসাধারণের হৃদয়ে চিরজীবী থাকেন। শচীন দেববর্মণও থাকবেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মানুষের জীর্ণ বাক্যে ছন্দ নতুন সুর দিয়ে অর্থের বন্ধন থেকে তাকে কিছু দূরে নিয়ে যায়। ছন্দে গ্রথিত বাক্যে সুরসংযোগ ঘটলে তার বিস্তার আরও সুদূরপ্রসারী হয় এবং তাতে যদি দরদী এবং প্রাণবান ব্যক্তির সুকণ্ঠ সংযোজিত হয় তবে মানুষের ভাষা আরও সুদূরগামী, আরও বেশি হৃদয়স্পর্শী হয়। শচীনদেবের কণ্ঠ বাংলা ভাষাকে অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী করেছে। তাঁর গাওয়া বিখ্যাত গানগুলির পংক্তি স্মরণ করলেই এ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিভাত

হবে ; যেমন "তুমি যে গিয়াছ বকুল বিছান পথে", "প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল", "নিশীথে যাইও ফুলবনে", "তুমি নি আমার বন্ধু রে", "গৌর রূপ দেখিয়া হয়েছি পাগল", "ধিক্ ধিক্ আমার এ জীবনে", "মন দুঃখে মরি রে সুবলসখা ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে", "ডাকলে কোকিল রোজ বিহান আমি মাঠের বাটে যাই", "মালাখানি ছিল হাতে", "যদি দখিনা পবন" ; "মেঘলা নিশি ভোরে মন যে কেমন করে" ; "পদ্মার ঢেউ রে, মোর শূন্য হৃদয় নিয়ে যা, যা রে" ; "বন্দর ছাড় যাত্রীরা সব জোয়ার এসেছে আজ", "মলয়া চল ধীরে ধীরে", "আমি ছিনু একা" "কথা কও দাও সাড়া"। বাঙ্গালী বহুদিন যাবত শচীন দেববর্মণের কণ্ঠের ওপর ভর দিয়ে তার অস্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা এবং পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নির্মল আনন্দ উপভোগ করতে পারবে। যন্ত্রসভ্যতার দৌলতে রেকর্ডিং এর বন্দোবস্ত হওয়ায় এ সম্ভব হবে। না হলে অতীতের শতসহস্র কণ্ঠের ন্যায় শচীনদেবের কণ্ঠও আমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে যেত।

শচীন দেববর্মণের মৃত্যুর পর আজ আমাদের কর্তব্য তাঁর গাওয়া যত গান যার যার কাছে আছে তার খোঁজখবর করা এবং সকল গানের রেকর্ডের একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী করা এবং যথাসম্ভব সেই সকল গান যাতে জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে পারে তার বন্দোবস্ত করা। শচীন দেববর্মণ যখন সত্যিকারের ভাল গলায় গাইতেন সেই সময় এদেশে লংপ্লেইং রেকর্ড বিশেষ তৈরী হত না। কিন্তু হয়তো অনেক অনুষ্ঠানে শচীনদেবের গাওয়া গান কেউ কেউ টেপরেকর্ড'এ ধরে রেখে থাকতে পারেন। সেগুলির সন্ধান করে তার মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচিত বাংলা গান যদি লংপ্লেইং রেকর্ড হিসাবে প্রকাশিত হয় তবে তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হবে। শচীনদেবের গাওয়া কয়েকটি হিন্দী গানও আছে যা বাংলা গানের মতই অপূর্ব, যেমন: "শ্যাম, শুনো মেরী বিনতি" এবং "পী লে হরিনাম কা প্যালা"।

বোম্বাই-প্রবাসী সলিল ঘোষ মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় শচীন দেববর্মণের জীবন সম্পর্কে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। শচীনদেবের জীবন সম্পর্কে এর থেকে বেশি প্রামাণিক বা বিস্তৃত কোন আলোচনা বাংলা বা অন্য কোন ভাষায় হয়েছে বলে আমি জানি না। কিন্তু সলিলবাবুর রচনাতেও সকল তথ্য প্রকাশ পায় নি বা প্রকাশিত তথ্যের সর্বত্র যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি। সলিলবাবু আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কথা চিন্তা করছেন। এ কাজ অনতিবিলম্বে সম্পন্ন করলে বিশেষ সময়োপযোগী হবে।

রাজকুমার শচীনদেব সঙ্গীত জগতে সাধারণ সদস্য হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সঙ্গীত জগতের রাজকুমার রূপে "বকুল বিছান পথে" বিদায় নিয়ে গিয়েছেন। জীবিতকালে "বাঁশী শুনে আর কাজ নাই", আজ তাঁর সেই বাঁশী স্তব্ধ, "বাজে না বাঁশী গো, বাজে না"। শচীনদেবের অভাবে তাই আমাদের "হিয়া কেঁদে মরে।"

সুভাষচন্দ্র সরকার

আধুনিক বাংলা গানের সংকট

বর্তমানে আধুনিক বাংলা গানের খুবই দুরবস্থা। আধুনিক গান লোকে আর আগের মতো উৎসাহ নিয়ে শুনতে চাইছে না। জলসাতে রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গান ক্রমশঃ প্রাধান্য পাচ্ছে, বাংলা ছবিতে আধুনিক গান ক্রমশঃ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আধুনিক গানের ক্লাশে ভর্তি হওয়ার ঝোঁক কমে গেছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মুখে আধুনিক গানের কলি আগের চেয়ে কমই শোনা যায়, আধুনিক গানের রেকর্ড বিক্রীর হারও নিম্নমুখী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে এবং কিশোরকুমার ছাড়া আর কোন শিল্পীর পরিবেশন আজকের শ্রোতাদের বেশিক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখতে পারছে না দেখে মনে হয় ওই সব শিল্পীদের কণ্ঠনিঃসৃত আধুনিক বাংলা গানের চেয়ে ওঁদের কণ্ঠ শুনতেই শ্রোতারা বেশি আগ্রহী। নিছক আধুনিক গানের জলসার রেওয়াজও কমে যাচ্ছে। ফলে আধুনিক গানের বাজার এখন মন্দা। আর বেশ কিছু সংখ্যক আধুনিকের শিল্পী ভিন্নতর গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছেন বেশ কিছুদিন যাবত।

আধুনিক বাংলা গানের এই দৈন্যদশার কারণ কি? বছর দশ বারো আগেও (অর্থাৎ ১৯৬২-৬৩ নাগাদও) তো এমনটি ছিল না! শ্রোতাদের রুচির পরিবর্তন হয়েছে বলে ব্যাপারটাকে লঘু করার প্রচেষ্টা হাস্যকর। শ্রোতারা তো বরাবরই নতুনের প্রতি আকর্ষণের সাধারণ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, যে আমলে রবীন্দ্রনাথের গানকেও আধুনিক গান বলে মনে করা হত, সেই আমল থেকেই এই আধুনিক গানের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়ে আসছেন। সেটা এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের কথা। ত্রিশের দশকে সমকালীন গান

হিসাবে নজরুল—হিমাংশু দত্ত—রাইচাঁদ বড়াল—পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখের সুরারোপিত এবং নজরুল—শৈলেন রায়—প্রণব রায়—বাণীকুমার—সুবোধ পুরকায়স্থ—অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ রচিত বাংলা গান আধুনিক বলে পরিচিত হল। কিন্তু সেইসব গান কোনো কোনো শ্রোতার কাছে পছন্দসই অথবা আবর্ষণীয় মনে না হলেও আপত্তিকর অথবা নিম্নরুচির অথবা নিম্নমানের বলে মনে হত না। বাণীর সঙ্গে সুরের সঙ্গতি নেই এমন সমালোচনাও বড় একটা শোনা যেত না।

তার পরবর্তী দশকে, অর্থাৎ চল্লিশের দশকে, আধুনিক বাংলা গান, পুরাতনী গান, ভজন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও লোক-গীতির চেয়ে ঢের বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে এক গৌরবময় উত্তীর্ণ হল প্রধানতঃ সলিল চৌধুরী—কমল দাশগুপ্ত—সুবল দাশগুপ্ত—শৈলেশ দত্তগুপ্ত—অনুপম ঘটক—রবীন চ্যাটার্জী—শচীন দেববর্মণ প্রমুখের নতুন নতুন ধারায় সুরসৃষ্টির আশ্চর্য সার্থকতায়। পঞ্চাশের দশকে আধুনিক বাংলা গান ছাড়া অন্য কোন গানই বাঙালী তরুণ-তরুণীদের মুখে ফিরতো না। লঘুসঙ্গীতের শ্রোতারা রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতির চেয়ে আধুনিক গানের প্রতি ঢের বেশী আকৃষ্ট ছিলেন। এই দশকে নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকারদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কিন্তু ষাটের দশকের শেষাশেষি আধুনিক বাংলা গানের প্রতিষ্ঠার ভিতে ভাঙন দেখা দিল। শুধু বিদগ্ধ জনই নয়, সাধারণ শ্রোতারাও আধুনিক গানের প্রতি ক্রমশঃ বিরূপ হতে আরম্ভ করলেন। আজ বছর তিন চার যাবৎ বক্সসফল বাংলা ছবির গান ছাড়া অন্য বাংলা গানের রেকর্ডের বাজার সঙ্কোচনমুখী। বাংলা ছবির গানের বাজারকেও তেমন একটা ক্রমবর্ধমান বলে গণ্য করা যায় না। বাংলা গানের শ্রোতারা আজকের অধিকাংশ আধুনিক গানকে শুধু ভালো লাগে না বলেই যে অগ্রাহ্য করেছেন তা নয়, সেগুলিকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বলেও মনে করছেন। এঁরা আধুনিকের বদলে এখন রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নজরুল গীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, এতদিনের

অবহেলিত রবীন্দ্র-নজরুল গীতির আবেশে মণ্ডিত আধুনিক গানগুলিকেই যেন বেছে বেছে তারিফ করছেন, আর বিদেশী অর্কেষ্ট্রাক্লিষ্ট ও বিদেশী সুর ভারাক্রান্ত আধুনিক গানগুলিকে ন্যক্কারজনক বলে বর্জন করছেন। এতাবৎকাল সলিল চৌধুরীর ধারাই আধুনিক গানে প্রাধান্য পেয়ে আসছিল এবং এই ধারাকেই অধিকাংশ সুরকার সজ্ঞানেই হোক অজ্ঞানেই হোক অনুসরণ করে আসছিলেন। সেই সলিল চৌধুরীর যুগ যেন সত্তরের দশকের প্রথমার্ধেই হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু কেউ নতুন পথের দিশারী হতে পারলেন না। আধুনিক গান রবীন্দ্র-নজরুল গীতির পুনরভ্যুদয়ের জোয়ারে মাঝিবিহীন নৌকোর মত হারিয়ে যেতে চলেছে। রেকর্ড কোম্পানীরা সিনেমার বাংলা গান ছাড়া আলাদা করে বাংলা গানের রেকর্ড করতে আগের মত আর আগ্রহী নন, কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সুধাকণ্ঠী শিল্পী ছাড়া অন্য কোন শিল্পীর কণ্ঠের আধুনিক গান বাজারে চলতে চায় না। অথচ ২৭।২৮ বছর আগে জনৈক প্রতিষ্ঠাহীন সাধারণ শিল্পীর কণ্ঠে এক নবীন সুরকারের সুরারোপিত গান 'কালনাগিনীর কালো মাথার মণি' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে রেকর্ড কোম্পানীর ঘরে প্রচুর পয়সা এনে দিয়েছিল। সেটা কিন্তু সিনেমার গান ছিল না।

আধুনিক গানের কেন এই সংকট? বলা যায় যে, এর কারণ প্রধানতঃ চারটি। প্রথমতঃ গীতিকারদের ব্যর্থতা, দ্বিতীয়তঃ শ্রোতার রুচিবদল; তৃতীয়তঃ সুরকারদের ব্যর্থতা; এবং চতুর্থতঃ গানের প্রচারক রেকর্ডকোম্পানী ও বেতার কর্তৃপক্ষের কিছুটা ঔদাসীন্য।

আধুনিক গানের গীতিকারদের দুর্বল রচনা বিদগ্ধজনের কাছে অনেক ক্ষেত্রে একঘেঁয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর মনে হয়েছে। যেমন ধরুন,

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
কি অপরূপ সৃষ্টি
আহা মিষ্টি মিষ্টি মিষ্টি
আমার হারিয়ে গেছে দৃষ্টি।

বৃষ্টিকে 'অপরূপ সৃষ্টি' বলে চিহ্নিত করার কবি-প্রয়াস বড়ই শিশু-সুলভ। কোন এক প্রখ্যাত গীতিকার কন্যাকুমারীকার বিবেকানন্দ-শিলায় গিয়ে হৃদয় দেয়ানেয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন দয়িতার কাছে এবং এ সম্পর্কে কোন এক বিখ্যাত বাংলা দৈনিকে জনৈক ক্ষুব্ধ পাঠক যে প্রতিবাদ করে সম্পাদক সমীপেষু পত্র প্রকাশ করেছিলেন তা বোধ করি সঙ্গীত মহলে কারো কারো এখনও মনে আছে। [১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীর শারদীয়া উপহারে অংশুমান রায়ের আধুনিক গানের রেকর্ড দ্রষ্টব্য]

তাছাড়া অনেক আধুনিক গানের ভাব আর ভাষা দুই-ই যে রবীন্দ্রনাথ থেকে চুরি করা সেটাও কালক্রমে ধরা পড়ে গেছে। যেমন, সন্ধ্যা মুখার্জীর রেকর্ডে আছে—'কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে' ('পথে হল দেরী' ছবিতে)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—(আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে'।) হেমন্ত মুখার্জীর রেকর্ডে আছে—আজ দুজনার দুটি পথ ওগো দুটি দিকে গেছে বেঁকে' ('হারানো সুর' চিত্রে)। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে'।

তা ছাড়া, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সংগে সংগে শ্রোতাদের সঙ্গীত রসাস্বাদনের মান ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এবং রুচিও কিছুটা পাল্টেছে। তাঁরা গানের কথায় যুগের সুখদুঃখের প্রতিফলন দেখতে চান, চান উচ্চ কাব্যগুণ, চান নতুন নতুন ভাবনার উন্মোচন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল কবিরা গান বড় একটা লেখেন না। আর যাঁরা গান লিখেছেন তাঁদের রচনায় কাব্যগুণের বড়ই অভাব। বোধ করি কিছুটা এই কারণে ভাল ভাল আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করে জনসমক্ষে পরিবেশনের একটা প্রচেষ্টা বছরখানেক যাবত দেখা যাচ্ছে, আর শ্রোতারা আধুনিক কবিতার সঙ্গীতরূপের অনুষ্ঠানে ভীড়ও করেছেন।

বিদেশী গানের সুর ও শৈলীকে অত্যধিকমাত্রায় মিশিয়ে এবং যত্রতত্র 'কর্ড' সংযোজন করে অভিনবত্বে সামগ্রিকভাবে শ্রোতাকে

বিহ্বল করা যায়, কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদের মনে দাগ কেটে তাদের দীর্ঘ দিন আকৃষ্ট করে রাখা যায় না। আধুনিক গানের প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের মধ্যে অনেকে এই কাজটাই এতাবৎকাল করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের মাটির সংগে, দেশের নাড়ির সংগে যার যোগ নেই তা তো আমাদের অন্তরে স্থায়ী আবেদন রাখতে পারবে না। তাই ছেলেবেলায় শোনা বাউল গান এখনও আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু সলিল চৌধুরীর লেখা ও সুর দেওয়া 'সাত ভাই চম্পা জাগো রে জাগো রে' কিংবা 'শোনো কোন একদিন আকাশবাতাস জুড়ে রিমঝিম বরষা' বেশিদিন ভালো লাগে না—গাইতেও না, শুনতেও না। সলিল চৌধুরীর অভ্যুদয় এবং অবলুপ্তি দুই-ই চমকপ্রদ। লোকসঙ্গীত আর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংগে বিদেশী সুরছন্দের বিস্ময়কর অথচ সার্থক সংযোজন ঘটিয়ে তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আধুনিক বাংলা গানকে এক নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ষাটের দশকে তিনি তাঁর মূল শৈলী পাল্টে ফেলে প্রধানত বিদেশী-সুরছন্দ সমৃদ্ধ গান তৈরী করার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। সেই সব গান আমাদের কানে চমক লাগালেও আমাদের হৃদয়ের গভীরে তারা যেতে পারলো না। যে সব আধুনিক গান লঘুসঙ্গীতের সচেতন ও বিদগ্ধ শ্রোতা আজও শুনতে রাজী হন সেগুলি হল সলিল চৌধুরীর আগেকার কিছু গান যেমন, 'গাঁয়ের বধু', 'রানার,, 'না যেও না', ইত্যাদি এবং শচীন দেববর্মণ-অনুপম ঘটক-রবীন চট্টোপাধ্যায়-শৈলেশ দত্তগুপ্ত-কমল দাশগুপ্ত-সুবল দাশগুপ্ত-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সুরারোপিত সেই সব গান যাদের সুরের মধ্যে পাওয়া যায় দেশের মাটির গন্ধ, আর আংশিকভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য এবং নজরুলগীতির সুরের পারিপাট্য। সলিল চৌধুরী ও তাঁর অনুগামীরা গত দশবছর যাবত—বলা চলে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত—যে ধরনের গান বাংলার মানুষকে পরিবেশন করে আসছেন তার আবেদন বর্তমানে খুবই কম। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গত দুই দশকে যে সব বাংলা

গানের রেকর্ড বাজারে উচ্চহারে বিক্রী হয়ে জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছে সেগুলি সলিল চৌধুরীর ধারাশ্রয়ীও নয়, কিংবা সলিল চৌধুরী সেগুলির সুরস্রষ্টাও নন। সেগুলি হল অধিকাংশই ছায়াছবির গান এবং তাদের সুরকাররা হচ্ছেন অনুপম ঘটক ("অগ্নি পরীক্ষা" চিত্রে), রবীন চট্টোপাধ্যায় ("পথে হল দেরী" চিত্রে), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ("মণিহার", "শাপমোচন", "বাঘিনী" ও "ফুলেশ্বরী" চিত্রে), রাজেন সরকার ("ঢুলী" চিত্রে), অনিল বাগচী ("এণ্টনি ফিরিঙ্গী" চিত্রে) নচিকেতা ঘোষ ("ধন্যি মেয়ে" চিত্রে), সুধীন দাশগুপ্ত ("প্রথম কদম ফুল" চিত্রে), সত্যজিৎ রায় ("গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" চিত্রে) এবং শ্যামল মিত্র ("দেওয়া নেওয়া" ও "অমানুষ" চিত্রে)।

সবশেষে, রেকর্ড আর বেতার কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের কথাও উল্লেখ করতে হয়। নতুন সুরকার ও গীতিকারদের আহ্বান করে তাদের মাঝখান থেকে প্রতিভা যাচাই করে বের করবার কোন প্রচেষ্টা এঁদের নেই। চেনামুখের সুপারিশপ্রাপ্ত নতুন অথচ মামুলী সুরকারদের তুলে ধরছেন, তাতে কোন লাভ হচ্ছে না, কেননা তারা আধুনিক গানকে কিছুতেই শিক্ষিত শ্রোতার কাছে আকর্ষনীয় করতে পারছে না। তাদের সুরে গভীরতার অনুভূতি পাওয়া যাচ্ছে না, অকারণ অর্কেস্ট্রাভারাক্রান্ত তাদের গান রসিক বিদগ্ধজনের শ্রবণকে পীড়া দেয় মাত্র। প্রতিষ্ঠিত সুরকার-গীতিকাদের হাতে যে আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ নিহিত নয় এই সত্যের উপলব্ধি রেকর্ড ও বেতার-কর্তৃপক্ষের আজও হয় নি—এটাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

অরুণ দাশগুপ্ত

মঞ্জুভাষ মিত্র

ফুল

এ জীবনে অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছি
অধীর হয়ে দেখেছি পাতার বুকে জেগে উঠছে কুঁড়ি
তারা ফুটে উঠেছে, মুখ নামিয়ে তাদের আদর করেছি
তারপর তারা ঝরে গেছে
শূন্য করে গেছে আমাকে ও আমার হৃদয়কে।

একটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে
এই যে, আমি ও আমার হৃদয়ের স্বপ্নসমূহ,
আমরা কার বাগানের ফুল ?
আমাদের ফুটে ওঠা ও ঝরে যাওয়া কার মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ?

রাত্রির সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে উত্তর পেয়েছি।

সুকুমাররঞ্জন ঘোষ

মিলন সম্পর্কিত

সারারাত মেলা বসেছিল—
তেমনি গভীর অন্ধকারে ;

হাজার প্রদীপকে উস্‌কে দিয়ে
উজ্জীবিত জীবন এবং আনন্দে।
স্বাদু শব্দে মন ভরিয়ে তুলতে
আরো এসেছে—আরো—আরো—
আরো অনেকে—
রাতের শেষের মেলা থেকে—
এখন স্বভাবের নির্জনে যেতে
মনের মতো প্রিয় নাম ধরে ডাকলাম,
মেলা উৎসবের—মিলন সম্পর্কিত
ভাষা শেখাবো বলে।

বিমান ভট্টাচার্য

তোমাকে নয়

দূর থেকে দেখছিলাম।
কথা বললে
আগুনের ফুলকিগুলো ঘর ভর্তি করে দিয়ে যায়
চলতে গেলে
পায়ের নীচে কেঁপে ওঠে সমস্ত ভুবন
চোখ খুললে
জন্ম মৃত্যু কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়
কাছে আসলে
দেয়াল ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়
হাত বাড়ালে

হাতে হাত রেখে বললাম
আমাকে সেই দিকে নিয়ে চলো
সহস্র শীর্ষের বুকে মুখ রাখি
তুমি নিরাপদ সীমানায় থেকে
ছুঁড়ে দিও ঘৃণার অঞ্জলি।

জয়ন্ত সান্যাল

বুঝি পলাতকা হবে ভালোবাসা

আকাশ মেঘলা থাকলে নিজের ভেতর
এক ধরনের জ্বর হয়
ঝড়ের বেগে কাঁপতে থাকে আত্মগত
কাশের জঙ্গল…
ক্লান্তি মেখে চোখ বুঁজি
কাছাকাছি তার পায়ের শব্দ…আঁচল
সামলানোর মৃদু হাওয়া…চুলের
ঘ্রাণ, সব মিলিয়ে
পরিচিত উপস্থিতি আঁচ করা যায়।
জ্বর বাড়ে।
আমি দৃষ্টি মেলি না কিছুতেই।
আসলে, আকাশ মেঘলা থাকলে
ভয় হয়
বুঝি ঝড়ের বেগে পলাতকা হবে ভালোবাসা।

মধুমাধবী ভট্টাচার্য

পাগল-করা নীলিমাকে

বহু প্রাচীন সেই নীলিমা
আবারও হেসে ওঠে।
দিগন্তের রেখা কাঁপতে থাকে
ওই জলরেখায়,
ঢেউ ভেঙে ভেঙে যাওয়া
কোন হাহাকারে।
তোমার ওই অসম্ভব সান্ত্বনাকে, ভেঙে ফেলতে
কতকাল জাগবে তুমি,
ওই উন্মাদগুলোর মত—যারা ইচ্ছে অনিচ্ছে
বিলিয়ে দিয়ে অসম্ভব ভাবে কাঁদে, হাসে,
অথবা নিষ্ঠুর। ভালোবেসে
জানায়,
এক পাগল-করা নীলিমাকে।

রবীন বাগচী

কয়েকটি ছড়া

১. নয়-ছয়-হক্কা
সব কিছু ফক্কা,
নামতায় নেই মিল,

বড় রাজা ছোট দিল,
মুখোশের নানা রঙ
মুখ ঢেকে সব সঙ
ভেজালের রাজ্যে
চেনা দায় খাঁটি কে যে
ভেলকী যে বিলকুল
কে বা ঠিক কে বা ভুল।

২. ভালোবাসা ছোট্ট কথা
অবাক একটা নাম
সব বিকিয়েও ভালোবাসার
যায় না দেওয়া দাম।
ভালোবাসার সঠিক মূল্য
দিত যদি বিশ্ব
রাতারাতি পাল্‌টে যেত
এই দুনিয়ার দৃশ্য।

৩. বস করেছেন হিউমার
ভাব বোঝে কার সাধ্য,
না বুঝলেও হাসতে হবে
হাসতে সবাই বাধ্য।
বস হেসেছেন, হাসতে হবে,
এই কথাটাই সত্য।

৪, তেলে নাকি ভর্তি ভেজাল,
তেলটা খেলেই ক্ষতি,
তবে কেন, তেলের জোরে
হচ্ছে পদোন্নতি ?

শুভ মুখোপাধ্যায়

জড়িয়ে আছে ভ্রমে

জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে আছে
মিথ্যা কিছু মিছিল এবং বেশ রূপবান,
উড়ুক্কু এক হাওয়ায় ভাসে চন্দ্রবোড়া —
বুলবুলিটা ভীষণ চোরা,
নিত্য বসে নৃত্য পটে বিলাসী পশ্চিমে,
মিথ্যা কিছু মিহিন এবং
    জড়িয়ে থাকে ভ্রমে।

স্বপন সেনগুপ্ত

অধিকার ভেঙে গেল

আমি নই তোমাদের সূচীভেদ্য আঁধারে দৃঢ়তা
কোলাহল থেমে গেলে আমি আসি
    ভক্ত কুকুর পেলে—
গ্রীবার কার্পাসে রাখি হাত।
নড়েচড়ে মেদে ও মজ্জায় এভাবেই মানুষ হতাম
তোমাদের দালানের বুক ঘেঁষে সুপোরীর চারাগাছ,
বখা ছেলে—

দলিলে কাগজে আমি তাইতো ছিলাম।
ঘন কুয়াশার মতো উদাসীন জ্যোৎস্নার ছাদে
আমি তো জেগেই ছিলাম—
কে আমাকে বিঁধে গেল ভ্রংশ বুদ্ধি আরণ্যক শরে ?

বিমল ভট্টাচার্য

কোথায় জ্বাললে আলো

কে আছো ঘরের মধ্যে দরজা খুলে দেখতে পাই না
অথচ আলোর নীচে সব স্পষ্ট, জামা জুতো ছবি
ঘড়ির আতুরে ডানা, মোমের ময়ূর-মূর্তি সবই
দিব্যি দেখা যায়, শুধু তোমাকে দেখি না।
কিন্তু তুমি ঘরে ছিলে, ঘরে আছো। একটু আগেও
একটা খুব অহঙ্কারী দাপট দেখেছি
একটু আগেও দুঃখে মিয়ানো গলার
কাঁদন শুনেছি, এই একটু আগেও
মমতা মাখানো দৃষ্টি বুলিয়েছো
    জামা জুতো ছবি ঘড়ি মুকুরে।
তবে কেন তোমাকে দেখছি না
সমস্ত ঘরেই আলো, দশটা মার্কারি বাল্‌ব
    ডিমার টিউব সব বিভিন্ন পাওয়ার
তুমিও তো ঘরে ছিলে, ঘরে আছো, অথচ অথচ—
কোথায় জ্বাললে আলো দেখা হয় চাক্ষুস সুন্দর ?

প্রদীপ রায়চৌধুরী

প্রিয় অভিমান

শিশু হয়ে কাঁদে কত রাত
গোপন চোখের জলে ভেসে যায় ধানের আলপথ
'সময় হলেই ফিরে আসব'—সে বলেছিল
অথচ ফিরলেও কিছু মুখ অচেনা হয়ে যায়
ভুলে যায় ছোঁনাচের আড়ালে কে থাকে
শীতের রাস্তার মোড়ে নিষ্প্রদীপ কৃষ্ণচূড়া একা,
বিধবা মেয়ের মতো উদাসীন,
বুকের আকাশ জুড়ে আলপনা আঁকা
ধুয়ে যায় শিশিরের নৈশ অভিযানে।

রাতের নক্ষত্র বড় ধীরে ধীরে চলে
অন্ধকার চোখ খোলে সকালের আলোর ডানায়
ঝড়ে পড়ে সতৃষ্ণ শিউলি
    যেন কিছু প্রিয় অভিমান।

প্রদীপ দাশশর্মা

কবি

একটা চেয়ার ছেড়ে অন্য চেয়ার—তুমি কোথাও না কোথাও
বসে আছো।   তোমাকে বসিয়ে রেখেছে চালচুলোহীন ওই কবি

সে তো এমন কিছু গর্গা নয় যে চাঁদ ও তার স্বচ্ছ প্রতিবিম্বের মত
তোমার ওই দুই স্তন এঁকে ফেলবে ক্ষুৎকাতরহীন,
আমরুলের মত জলভরা চোখ ।

প্রস্তর যুগের কথাই ধরো সে সময় তোমার বুক ছিল পাথর
প্রস্তর যুগের কথাই ধরো সে সময় অস্ত্র ছিল পাথর
তবু তোমায় হানলে হত ফুল, শব্দপ্রকরণহীন জীবন।
তারপর কতশতদিন বহে গেছে হা ঈশ্বর কতশত দিন
ছাইদানি, পাণ্ডুলিপি, কাঠের টেবিলের একপাশে
ঘুমিয়ে পড়েছে কবি নয় এক ক্লান্ত ঘোড়সওয়ার
যার পশ্চাতে উপবিষ্ট প্রোফাইল, আর্ত নখ
তার পোষাক ধরেছে খামচে, দিগন্তে উড়ছে শাড়ির আঁচল
বুকের দুই রক্ষিত আপেল ভিজে গেছে হলুদ কুয়াশায়
সে সময় কবির সাদা কাগজের মত ঠোঁট আর তার পোষাক থেকে
শব্দেরা ঝরে পড়ছে
হায়, যেন অসংখ্য সাদা ক্রশ ছেটানো জ্যোৎস্নায়।

স্বপ্না মজুমদার

খুঁজতে বেরিয়েছি

বন্ধু,
লুকোনো জলপ্রপাত খুঁজতে বেরিয়েছি।
দারুণ তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।
ইতিমধ্যে পরীক্ষা করে নিলাম ;
বুকের মধ্যে হাতুড়ির শব্দ, বৃষ্টির আওয়াজ, বাতাসের শোঁ শোঁ...

অর্থাৎ যা যা থাকার সব ঠিকঠাক আছে।
এমন কি—
পুরনো স্মৃতিগুলোও সব মস্তিষ্কের খোপে…
এই সমস্ত নিয়ে চলেছে আমার অগোছালো আমিটা ;
আর হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে
সেই জলপ্রপাত—
সেই লুকোনো জলপ্রপাত—

মন যার শব্দ শুনেছে,
আর হৃদয় যার জন্য ঘর-বিবাগী ॥

ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য

কয়েকটি কবিতা

১. বহুদিন আগে
এক নির্জন মৃত্যুকে আমি চেয়েছিলাম
তার শীতের নিঃশ্বাস
আমার বিছানায় ছিল, তোমার মনে আছে
শূন্য রাতে ভাঙা দৃষ্টি মেলে
তোমার সীমানায় এসে দেখি
দীর্ঘদিন……
আমার বিছানায় মৃত্যু ছিল।

২. অন্ধকার এক চিরস্রোতে ভেসে চলেছে
ক্লান্ত আমি……

পাহাড় ভেঙে ভেঙে
তুমি ভাবছ……
শেষরাতের আগে ফিরব কি জীবনে।

৩. সিঁড়ি গুণতে গুণতে নেমেছি
যেখানে তুমি দাঁড়িয়েছিলে
কখনো শূন্য হাত পেতে
পূর্ণ করতে এসেছি

কিন্তু তুমি যে শন্যতাকেই স্থির চেয়েছিলে!

প্রভাত মিশ্র

অশ্রুত শব্দের তরল

যতটুকু নীল জল রাখা যায় এই পাত্রে ঠিক ততটুকু রাখা যাবে
স্বপ্নের অমৃত;
ফিরেছো দহনদিনে অশ্রু বুকে জমজমাট;
হিম পতনের ধ্বনি তোমার চলার পথে প্রেয় ও বাঙ্ময়
তুমি এ পাত্রে ঢালো নীল, ঢালো ফেনিল দুর্লভ।
সহসা কি আস্তরণে জেগে উঠলো আমাদের দুর্দিন যাপন,
বুকে লাগলো উষ্ণতা ও গলে যাওয়া অইসব
হিম, তোমার হৃদয়কুঠি, নির্মল—

তোমাকে দেখতে চাই অনিবার ও সংযমপিয়াসী
মানুষের কেশগুচ্ছে মাঝে মধ্যে হাত রেখে, বলো তুমি তাই
জীবনের তটসীমা যেখানে থামলো সেইখান থেকে

কিভাবে ভাবনা যায়, এলোমেলো
এই পাত্রে হাত রাখো, রাখো হাত, রেখে
দেখ যতটুকু নীলজল রাখা যায় ঐ পাত্রে
ঠিক ততটুকু রাখা যাবে অশ্রুত শব্দের তরঙ্গ।

অন্যমন দাশগুপ্ত

রপ্ত হতে হয়

সুন্দর কবিতার তীরে শব্দ ছোটে আনন্দের।
কবি বা ধনুক শুধু দুঃখ পায়
এই অগ্রসরমান পথে এসে ভাগ্যের আদেশে
রপ্ত হতে হয় তাকে সমস্ত হাওয়ায়।
প্রকৃত বনের মধ্যে স্বেচ্ছায় একা
তারি মধ্যে বেড়ে ওঠে চুলের কৃশতা, ছাই।

কালীঘাটের পটশিল্প

সাধারণ একটু রং আর কাগজ অসাধারণ তুলির স্পর্শে কেমন করে সার্থক শিল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে তা বাংলা দেশের পট-শিল্প থেকেই বোঝা যায়। এই সফলতাই পট-শিল্পকে বাঙ্গালী রসিক হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যুগে যুগে বাঙ্গালীর অন্তরে প্রবাহিত করেছে ভক্তিরসের অমলিন ধারা।

প্রায় খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে মস্করী উপাধি ধারী একদল ব্যবসায়ীদের কথা আমরা জানতে পারি, যাদের জীবিকা ছিল পটশিল্পের মাধ্যমে লোক-শিক্ষা প্রচার করে অর্থ উপার্জন করা। এই পট শিল্পের মধ্যে আমরা যেমন শিক্ষামুলক ছবি (যমালয়ে শাস্তি দান প্রভৃতি) দেখতে পাই তেমনি আবার ব্যঙ্গ-রসাত্মক ছবিও থাকতো। বৌদ্ধ যুগেও এদের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এই সব পট কাগজের পরিবর্তে কাপড়ের উপর আঁকা হত। সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের তত্ত্ব সহজ ভাবে প্রচারে পটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতকের কাহিনী-পট ভাষার বাধাকে অতিক্রম করে দূর-দূরান্তে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন পটে প্রধান উপজীব্য ছিল পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্মীয় উপাখ্যান। পট শিল্পীরা সাধারণ ধর্মে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তুলির টানে কাগজের বুকে ফুটিয়ে তুলতো নানা দেব দেবীর মূর্তি এবং পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ বিশেষ চিত্র। ধীরে ধীরে তাদের নজর পড়ল সমাজের দিকে; সামাজিক কাহিনীও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দিল তাদের হাতে। এই ভাবে পটুয়ারা বেঁচে ছিল সমাজের বুকে যুগ যুগ ধরে। তবে এই সমস্ত পটুয়ারা প্রায়শই তাদের ব্যবসা জমানোর জন্য ভীড় করত ধর্মীয় স্থানগুলিতে। কারণ অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা দেখি এদেশের ধন, জ্ঞান ও কর্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয়

তীর্থস্থানগুলিকে কেন্দ্র করে। তীর্থস্থানগুলি তাই অন্যতম ব্যবসার স্থান রূপে গড়ে উঠেছিল; বিশেষ করে তীর্থস্থানগুলিতে দেব-দেবীর মূর্তি ও ছবি কেনা-বেচার সুযোগ পাওয়া যায়, এইজন্য কালীঘাট তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একদল পটুয়া। এঁদের আঁকা ছবি কালীঘাটের পট নামে খ্যাত হ'ল।

১৮০৯ সালে শক্তিপূজার একান্নটি কেন্দ্রের অন্যতম কেন্দ্র কালীঘাটে প্রতিষ্ঠিত হ'ল কালীমন্দির। আদিগঙ্গার তীরে এই মন্দিরটি তৈয়ারীর সময় থেকেই কলকাতা শহরের বিকাশ পর্ব শুরু হয়। শহর নির্মাণ পর্বের সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে থাকে এবং কালক্রমে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে কালীঘাটের যশ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, ফলে তীর্থক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করে চারপাশের অঞ্চল বেশ সরগরম হয়ে উঠে। এর পর দেখা যায় যে ১৮২৫-২৬ সাল থেকে কালীঘাট অঞ্চলে দেব-দেবী পট চিত্র আঁকা শুরু হয়। পট চিত্রগুলির চাহিদা বৃদ্ধি দেখে বাংলাদেশের নানা জেলা থেকে পটুয়ার দল এসে ভীড় জমাতে আরম্ভ করে। এই রেখা-সর্বস্ব পটচিত্রগুলি কালীঘাটের পট নামে খ্যাত হয়। এই ভাবে কালীঘাটের শিল্পীগোষ্ঠি শুরু করেন তাঁদের ব্যবসা। কালীঘাটের পটুয়াদের এই ব্যবসা কেবল মাত্র পটচিত্র আঁকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না—মন্দির তৈয়ারী, কাঠ-মাটির খেলনা, পুতুল ও দেব-দেবীর মূর্তি, প্রতিমা ও মন্দির অলঙ্করণের কাজে বেশ রপ্ত থাকার এই ব্যবসাও তাঁরা করতেন বেশ জাঁকিয়ে। এই পটুয়ার দল গোষ্ঠিবদ্ধভাবে বাস করতে। কলকাতার যে অঞ্চলে এঁরা বাস করতেন সে অঞ্চল ছিল পটুয়াটোলা নামে খ্যাত।

কালীঘাটের পটুয়াদের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা পাই না। তবে এই শিল্পধারার প্রথম যুগে কিছু কিছু শিল্পীদের নাম আমরা পাই, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তালিকায় রয়েছে নীলমণি দাস, বলরাম দাস ও গোপাল দাস। এঁরা প্রথম যুগে কালীঘাট পটচিত্রশিল্পী হিসাবে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য

শিল্পীদের নামের তালিকায় কালীচরণ ঘোষ ও কানাইলাল ঘোষের নাম পাওয়া যায়। এঁরা মূলতঃ ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গড়িয়া অঞ্চলের অধিবাসী। পরে এরা কালীঘাট অঞ্চলে এসে পাকা-পাকি ভাবে বসবাস শুরু করেন। এদের সমসাময়িক আরও তিনজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে—বটকৃষ্ণ পাল, পরাণ দাস ও বলাই বৈরাগী।

কালীঘাটের এই সমস্ত শিল্পীরা ছিলে মূলতঃ লোকাশ্রয়ী, ফলে দেব-দেউলের ভিত্তিচিত্র আঁকার অধিকার এঁদের ছিল না। এই সময়ে বাংলাদেশে কতগুলি মন্দিরের ভিত্তি চিত্রের সন্ধান পাই। মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামের শ্যামসুন্দর মন্দির, বীরভূম, দুবরাজপুর ও ইলমেবাজারের শিবমন্দির, হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির, বাজিতপুরের দশ-ভুজার মন্দির প্রভৃতি। এই সমস্ত মন্দিরগুলির মধ্যে বহড়ুর শ্যাম-সুন্দর মন্দিরের ভিত্তিচিত্র যে শিল্পী এঁকেছিলেন তাঁর নাম ছিল দুর্গাচরণ ভাস্কর। মন্দিরটি তৈরী হয় ১৮২৬ সালে। কালীঘাট পটের শিল্পীরা ঐ সময় থেকেই রং-তুলি নিয়ে পটের ব্যবসা শুরু করেন।

কালীঘাটের পটুয়ারা এদের ব্যবসার পসার জমিয়েছিলেন প্রায় ১০০ বছর ধরে অর্থাৎ ১৮২৫-২৬ সালে থেকে ১৯২৫-২৬ সাল পর্যন্ত। এরপর এদের ব্যবসা দুর্বল হয়ে পড়ে। এদের ব্যবসা এতদিন যে সমাজের উপয় নির্ভরশীল ছিল, পশ্চিমী সভ্যতা এসে এঁদের উপহার দিল সস্তায় ছাপানো পট। কালক্রমে এই বিদেশী ছাপানো পট এদের চাহিদা পূরণ করতে লাগল। এ ছাড়াও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলের ছাত্ররা দেব-দেবীর লিথোগ্রাফ তৈরী করে অল্পদামে বিক্রী করতে শুরু করেন। এই সমস্ত কারণে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই পটুয়াদের আঁকা কালীঘাটের পটের চাহিদা কমে যেতে থাকে, ফলে পটুয়ারা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে কালীঘাট অঞ্চল ছেড়ে নবদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিতে চলে যেতে শুরু করেন। এই ভাবে ২৫-৩০ বছরের মধ্যে কালীঘাট চিত্রশিল্পের ধারা প্রায় শেষ হয়ে যায়।

কালীঘাট পটের প্রথম দিকের চিত্রগুলিতে বিষয়বস্তু ছিল পৌরাণিক ও দেব-দেবী সম্পর্কিত। শিব-পার্বতী, বিষ্ণুর নৃসিংহ মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, বলরাম, সরস্বতী, রামসীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি ছিল চিত্রের বিষয়বস্তু। এই সমস্ত চিত্রের উপাদান পেতেন শিল্পীরা রামায়ণ মহাভারত থেকে। পরবর্তী কালে শিল্পীরা তৎকালীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছবিতে কিছু কিছু চিত্রন করেছেন এবং এই সমস্ত ছবিগুলি বেশ সমাদর পেয়েছে। এ জাতীয় ছবিগুলির মধ্যে বীরশ্যামাকান্তের সঙ্গে বাঘের লড়াই উল্লেখযোগ্য। শ্যামাকান্ত ১৮৫৮ সালে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সে যুগে বাংলাদেশে সাড়া জাগিয়েছিলেন। তাঁর এই বীরত্বের কাজকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য পটুয়ারা চিত্ররচনা করেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে চলতেন শিল্পীরা।

সামগ্রিক ভাবে কালীঘাটের পটচিত্রগুলিকে বিষয়বস্তু অনুযায়ী মোটামুটি ছয় ভাগে করা যেতে পারে :

১ [illegible] চিত্র
২ ঐতিহাসিক চিত্র
৩ সামাজিক চিত্র ও প্রতিকৃতি
৪ পশুপাখির চিত্র
৫ গল্প চিত্র
৬ ব্যঙ্গ চিত্র

পৌরাণিক ছবিগুলির মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা, শিবদুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, জগন্নাথ, রামায়ণের কাহিনী লৌকিক দেব-দেবীর রূপায়ণ দেখতে পাই। ঐতিহাসিক ছবিগুলির মধ্যে আমরা দেখি রাণী লক্ষ্মীবাঈ, গোরাসৈন্যের চলাচল, আদালতে খুনের বিচার, শ্যামাকান্তের বীরত্ব প্রভৃতি।

সেই সময়কার কাহিনী যেগুলি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল

সেগুলির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত সামাজিক চিত্রাবলী আঁকা হয়েছিল তার মধ্যে মোহান্ত-এলোকেশী রহস্য, নরনারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রকাশ, বহুবিবাহ, স্ত্রৈণ স্বামী, মদ্যপ স্বামীর অত্যাচার প্রভৃতি চিত্রগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থভাগের মধ্যে পশুপাখির চিত্রাবলীর বিড়াল, বিভিন্ন রকমের মাছ, বিড়ালের মাছ বা পাখি শিকার, সাপের ব্যাঙ শিকার, গাছের ডালে টিয়া, পায়রা, সিংহ, শিয়াল, হরিণ প্রভৃতি জীবন্ত ছবিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য উপদেশমূলক নানা কাহিনীও গল্পচিত্রের মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। এ ছাড়া ব্যঙ্গ-চিত্রাবলীর মধ্যে দেখতে পাই সেই সময়কার সমাজ-জীবনের নানা অনাচার ও কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা।

সামগ্রিকভাবে আমরা দেখি যে এই সমস্ত পটচিত্রগুলির মধ্যে বাঙালী মনের ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক সংস্কার, সাধ-আহ্লাদ আশা-ভরসা ও কামনা বাসনার মূর্তি প্রতিফলিত। কালীঘাটের পটচিত্রগুলির মধ্যে মূলতঃ দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটি ধর্মচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অন্য ধারাটি পরিবেশ চেতনার দ্বারা প্রভাবিত।

কালীঘাট পটচিত্রের মধ্যে দেবদেবী ও পৌরাণিক চিত্রের সংখ্যাই বেশী। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে কালীঘাট শিল্প যুগের প্রথম পর্বে ধর্মস্থানের মাহাত্ম্য বজায় রাখার উদ্দেশে ও পশার জমাবার জন্য কেবলমাত্র দেবদেবীর ছবি দেখতে পাই। পরবর্তীকালে তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে যে সমস্ত শিশুরা আসত তাদের জন্য আঁকা হত পশুপাখির ছবি। সহজ সরল ধর্মভীরু লোকেরা এই সমস্ত পট সংগ্রহ করে বাড়ীতে ধূপধুনা দিয়েও পূজা করত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পটের চাহিদা বেড়ে যেতে থাকায় বিষয়বস্তুর রকমফের হতে থাকে; ফলে ঐতিহাসিক সামাজিক, ব্যঙ্গচিত্র, গল্পচিত্রের রূপায়ন দেখতে পাই। পরবর্তীকালে রঙিন লিথোগ্রাফির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য পটচিত্রগুলিকে চটকদার করবার উদ্দেশ্যে রেখার সঙ্গে রঙের ব্যবহার দেখা যায়; তাই এই সময়কার পটচিত্রগুলিতে কালো, হলুদ, নীল

ও লাল রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করি। কিন্তু এই রঙের ব্যবহারে পট-চিত্রের মধ্যে আর সারল্য দেখা যায় না।

কালীঘাট পটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় রেখার বলিষ্ঠতা। সবচেয়ে বড় কথা হল, চিত্রকর তার আঁকা ছবিতে যে কথা বোঝাতে চাইত তা অব্যর্থ তুলির টানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। অশিক্ষিত গ্রাম্য পটুয়া সাধারণ তুলির টানে অবিচ্ছিন্ন গতিতে দেহের ভাবভঙ্গি, বলিষ্ঠ ও কমনীয় ভাব এবং মনের ও দেহের ভাবাবেগ কি রকম সার্থকতার সঙ্গে কাগজের উপর ফুটিয়ে তুলতেন তা এখনও পর্যন্ত বিস্ময় ও প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। রেখার আভিজাত্য ও ছন্দোবোধ ও সহজধারা এদের শিল্পকে কৌলিন্যের অধিকার দান করেছে। তাঁদের চিত্রে নানারকম সরু ও ও মোটা সহজ রেখার ব্যবহার অনেক সময় নিরর্থক মনে হলেও তা চিত্রকে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ও গৌরব দান করেছে। অনেকে পট শিল্পের নগ্নতার অভিযোগ করেন; কিন্তু বাহ্যিক নগ্নতাকে অতিক্রম করে 'শিব', 'মা ও ছেলে' প্রভৃতি ছবিতে যে অতুলনীয় আন্তরিকতার পরিচয় মেলে ও অন্তর্জগতের সন্ধান পাওয়া যায় তা সত্যিই দুর্লভ। পটশিল্পের জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল তার সুন্দর সাবলীল বিকাশ ও সাধারণের কাছে এর সহজ আবেদন। মন্দিরের আশেপাশে অন্ধকার গলিতে ছোট ছোট দোকানঘরে বিক্রী হত বলেই এগুলিকে হেটো ছবি বা বাজার পেইন্টিংগস বলা হত। কিন্তু তাতে কালীঘাট-পটের মর্যাদা নষ্ট হয় নি।

রেখা-সর্বস্ব এই চিত্র ও কালীঘাট-পটের সৃষ্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে ভারতীয় চিত্রধারার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দরকার। ভারতীয় চিত্রধারার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেখার দক্ষতা, গতিছন্দ ও বলিষ্ঠতা। মডেলিং, আলোছায়া দূরত্ব নির্ণয় (পারস্পেকটিভ) ও রং এগুলিকে খুব বেশী মূল্য কোনদিনই দেওয়া হয় নি। অজন্তা ও বাগ, গুহার ছবিগুলি দেখলে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি। ভারতীয় শিল্পীর সার্থকতা এসেছে রেখার গুণাগুণ, ছন্দ ও ভাব

প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বাংলার চিত্রশিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলিই পরবর্তীকালে অনুসরণ করে এসেছেন। পাল রাজত্ব ও পরবর্তীকালের পুঁথিশিল্পের ধারান্তর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে প্রবহমান রেখার এই মণ্ডনান্বিত গতিই এই সমস্ত ছবির মেরুদণ্ড। পুঁথিচিত্রগুলি ছাড়াও সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম এলাকায় তামার পাতে আঁকা যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রেখাচিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' আদিপর্ব বইতে উল্লেখ করেছেন: 'উভয় চিত্রেই তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ এবং সে রূপায়ণে সজীব প্রবাহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতিও অক্ষুন্ন। তবে বেশ বুঝা যায়, যেখানেই সামান্য সুযোগ পাইয়াছেন শিল্পী সেখানেই চঞ্চল বঙ্কিমরেখা প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।'

বাংলাদেশের পাটাচিত্র, জড়ানো পটচিত্র বিষ্ণুপুরের দশাবতার, তাস এগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বহিঃরেখার সূক্ষ্মতা ওঠে চিত্র এবং সাবলীল গতি প্রচ্ছন্নভাবে পূর্বের ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এই ধারা আমরা লক্ষ্য করি।

উনিশ শতকে তৈরী বীরভূমে জয়দেবের কোন্দুলী ও বর্ধমানে বনকাটির রথের গায়ে খোদাই করা পৌরাণিক চিত্রগুলি অপূর্ব গতিময় ছন্দোময় রেখার মধ্যে সজীব ও গতিছন্দোময় এক অপূর্ব সুষমা সৃষ্টি করেছে। এ জাতীয় সুষমা ঢাকা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজসাহী, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদীয়া, ২৪ পরগণার পটচিত্র, মাটির পুতুল, লক্ষীসরা, মনসার ঘট প্রভৃতির মধ্যে লক্ষ্য করি।

কালীঘাটের পটশিল্পীরা সময় ও উপকরণ সম্পর্কে এত মিতব্যয়ী ছিলেন যে একটু কাগজ, একটু রঙ আর তুলি কাজের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। মেয়েদের শাড়ী আঁকতে গিয়ে কালো পাড়টি এঁকে বাকী অংশে আলতা তুলির দাগ ফেলে কাপড়ের ভাজগুলি দেখানো হত। একটা কালো রঙের তুলি অবলীলাক্রমে টেনে তারা সমস্ত ভাবভঙ্গী এক আঁচড়ে এঁকে ফেলতে পারতো। সবচেয়ে বড় কথা হল, চিত্রকর তার চিত্রে যে কথা বোঝাতে চাইতো তা অব্যর্থ তুলির টানে সুস্পষ্ট

হয়ে উঠতো। বহু পট শিল্পগুণ অতিক্রম করে কাব্য ও ব্যঙ্গ রসে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁদের ছবিতে সরু ও মোটা রেখার সহজ ব্যবহার অনেক সময় নিরর্থক মনে হলেও তা ছবিকে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ও গৌরব এনে দিয়েছে।

কালীঘাট পটগুলিতে আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেখার বাস্তবতা-বোধ। রেখার মধ্যে শিল্পী পুরুষদেহের গতিকালে শক্তি, নারীর শান্ত সুকোমলশ্রী ও কমনীয়তা, জেগে থাকা ও ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় দেহরেখার দুই রকম ভাব, ভক্ত ও সাধকের চোখের ও ঠোঁটের আত্মতৃপ্তি, শিকারী বিড়ালের গোঁফ ও চোখের মধ্যে দিয়ে পাওয়া ও না পাওয়ার আশঙ্কা কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। সব শেষে বলা যায় পটশিল্পের জনপ্রিয়তার মূল কারণ ছিল এর সুন্দর সাবলীল বিকাশ ও সাধারণের কাছে এর সহজ আবেদন।

পটশিল্পের বিকাশে মেয়েদের ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য ছিল না। অনেকের মধ্যে বেশ দক্ষতার পরিচয় মেলে। এক যুগে যখন আদর্শ পট আর বিক্রি হতো না, মেয়েদের কাজ ছিল পটের নকল করে তাতে রঙ কলিয়ে বাজারে বিক্রী করা। এমন কি বর্তমানে বাংলার পটশিল্প ঘরে ঘরে যেটুকু বেঁচে রয়েছে তা তাদেরই ঐকান্তিক চেষ্টায়। তাই লক্ষ্মীপট আজও দুর্লভ নয়।

আধুনিক শিক্ষিত শিল্প সমাজে পট-শিল্প নিয়ে নতুন করে চর্চা হচ্ছে না, তাই এই অবক্ষয়ের হাত থেকে পট শিল্পকে রক্ষা করার দায়িত্ব যে কতখানি আজ তা ভাববার সময় এসেছে।

বর্তমানে পট শিল্পের গণ্ডীবদ্ধ চর্চা ও প্রচারের কথা চিন্তা করার বিষয়। এই দুরবস্থার কথা ভাবলে যে কারণগুলো মনে আসে তার মধ্যে অন্যতম হলো আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব। সাবেকী চিত্রকররা বড় মানুষ হতে চাইতো না। তাদের অভাববোধ ছিল খুবই কম। কিন্তু পরবর্তীকালে নানারকম কারণে ও সামাজিক পরিস্থিতেতে পটশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন সম্ভব হলো না।

অসীমকুমার ঘোষ

মেঘদূত

[বাংলা সাহিত্যে মেঘদূতের অনুবাদ নতুন কিছু নয়। বহু কবির অনুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর মধ্যে বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদটি শুধু মূলানুগ নয়—নতুন ব্যঞ্জনায় মুখর। বুদ্ধদেব বসু মূল সংস্কৃত ধ্বনির কাছাকাছি ছন্দে লিখলেও মন্দাক্রান্তা করেন নি। তার কারণ হিসাবে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। মেঘদূত আমার প্রিয়কাব্য। হঠাৎ কৌতূহলবশতঃ আমি মন্দাক্রান্তার পুরো চাল বজায় রেখে মেঘদূত রচনা সম্ভব কিনা তাই দেখতে গিয়ে এই অনুবাদে হাত দিই। পাঠকের কাছে তাই এটা ভাল লাগতে পারে সে কারণে।

মাত্রা সম্পর্কে বক্তব্য 'য' পুরো একমাত্রা ধরে নেওয়া হয়েছে সর্বত্র। এছাড়াও দু-একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে : অনুবাদক]

কোনো এক যক্ষের মহিমা অপগত কান্তা বিরহেতে ভাগ্যহীন,
রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হল ; প্রভুর অভিশাপে বর্ষাকাল।
কুটির বাঁধলো শেষে—যেখানে তরুগণ স্নিগ্ধছায়া দেয় এবং স্বস্তি ;
পুণ্যে উচ্চারিত শীতল জলধারা জনকতনয়ার মধুর স্নানে। ১

বিচ্ছেদ নিদারুণ একাকী প্রিয়াহারা কাটায় মাসগুলি নিরন্তর,
কঙ্কন খসে পড়ে ; শরীর হল ক্ষয় ; কামের চিন্তায় অহর্নিশ,
সমাগত আষাঢ়ের প্রথম সেদিনেতে দেখল মেঘময় গিরির দেহ।
মণ্ডিত হস্তীর শোভন শোভা ধরে ক্রীড়ায় মেতে ওঠে পাহাড় পরে। ২

উদিত যে মেঘে হয় সঞ্চারিত কাম হঠাৎ তাকে দেখে চোখের কাছে
অসুখী সে বল্লভ অশ্রুমাখা চোখে উদ্বেলিত হয়ে ভাবল মনে ;

হৃষ্ট প্রেমিকারাও উদাস হয়ে পড়ে, দেখলে পরে ওই নবীন মেঘ ;
বঞ্চিত তৃষ্ণায় তার কি কথা আর যে চায় পত্নীর আলিঙ্গন। ৩

অন্তর জর্জর কেমনে কাটে তার সঙ্গীহীন ঘরে মেদুর দিন
আনন্দে উদ্যত পাঠাই জলধরে যদি না দূত করে সুসংবাদ।
মল্লিকা পুষ্পের অর্ঘ হাতে নিয়ে যক্ষ এই ভেবে প্রীতির গান,
মন্ত্রিত কণ্ঠের স্বাগত সম্ভাষ, শোনাল মেঘবরে মধুর স্বরে। ৪

বাতাস ধূমের আর জলের আলোকের শুধুই সমাহার মেঘের রূপ
ইন্দ্রিয়ে সজ্ঞান প্রাণীর মতো হায় তার কি আছে বলো চতুর মন!
জ্বালানলে দুর্বার চেতনাহত প্রায় ব্যস্ত প্রার্থনা উচ্চার করে ;
বিচ্যুত ভেদাভেদ হল সে বিরহীর এই তো আজ তার স্বভাব কাজ। ৫

পুষ্করাবর্তের বংশে জাত মেঘ পৃথিবী বিখ্যাত তোমার নাম।
ইন্দ্রের নির্ভর ধরো হে মনোহর, কান্তিময় রূপ যেমন খুশি ;
প্রতিকূল দৈবের আঘাতে ঘরছাড়া বন্ধু, আজ তাই তোমার কাছে
প্রার্থিত বর দাও ; গুণী না দিলে তবু, অধম দান নিতে ইচ্ছে নেই। ৬

নিষ্ঠুর যক্ষের কঠিন অভিশাপে কান্তা থেকে আছি অনেকদূর।
সকুশল সন্দেশ প্রিয়ার কাছেতেই, পয়োদ নিয়ে যাও করুণা করে!
সান্ত্বনা তৃষিতের তোমাকে জানি আমি অলকাপুরী যাবে যেখানে শিব,
উদ্যান স্থিত হয়ে আপন ললাটের কিরণে ভবনেরে করেন আলো। ৭

স্পন্দিত বায়ুভরে করবে আরোহণ, পথিকবনিতারা অলক তুলে
বিশ্বাসে নির্ভর দেখবে তোমাকেই ; প্রিয়ার ঘরে ফেরা দিবসটিকে।
বিদগ্ধ পরাধীন আমার মতো নয়, সে জন পারে নাকি না করে দূর,
দুঃখিত প্রেমিকার হৃদয় জ্বালাটুকু, গগনে দেখা দেবে যখন তুমি। ৮

অল্প অল্প সেই বাতাস অনুকূল তোমাকে নিয়ে যাবে শূন্য পথে।
চাতকীরা চঞ্চল তুলবে সুরতান, গরবে বামদিকে ভাসতে থেকে।

গর্ভিনী বলাকারা, মালার মতো হয়ে ; আকাশ পথ জুড়ে, হবে যে সাথী।
উদ্বেল উজ্জ্বল দৃশ্যমান মেঘ তোমাকে সেবা করে তুলবে সুখে। ৯

একটি একটি করে দিনের গণনাতে আশায় বেঁচে আছে এখনও যে,
অবাধ গতিতে যাও ভ্রাতৃবধুর পাশে বন্ধু একমনা হয়ে সে আছে।
ফুলের তনুটি তার বিরহে ভঙ্গুর, দেখতে পাবে তুমি পাংশু রঙ।
প্রতিহত আশ্বাস, আশার বাণী ছাড়া কি আর বলো
তাকে বাঁচিয়ে রাখে ? ১০

প্রভাবিত শক্তিতে পৃথিবী উর্বর জন্ম নেয় কত ব্যাঙের ছাতা ;
উতরোল চঞ্চল মরাল-মরালীরা শুনতে পেলে পরে তোমার ডাক।
মানসোৎসুক তাই পদ্মডাঁটাগুলো পথের প্রয়োজনে ঠোঁটেতে তোলে ;
শূন্য মার্গ ধরে বন্ধু কৈলাশে ওরাই হবে তব সঙ্গদাতা। ১১

উন্নত নগরাজ তোমার বন্ধু যে বিদায় নিয়ে যাও যাবার আগে।
বন্দিত ত্রিভুবন শ্রীরাম পদরেখা রয়েছে আঁকা তার কটির পরে।
বছর বছর বাদে বরষা দেখা দিলে সে পায় ফিরে তব সাহচর্য।
জমাট মমতাভরা ; বিরহ উপজাত উষ্ণ অশ্রু হয় উন্মোচিত। ১২

পন্থার বিবরণ প্রথমে বলি শোনো, বলছি আমি মেঘ সুষ্ঠুরূপে।
প্রিয়তমা সংবাদ বলব পরে যাহা, শুনবে কান ভরে সেসব কথা।
মুহূর্তে ক্লান্তির বিশ্রাম প্রয়োজনে এলিয়ে দিও দেহ পাহাড় চূড়ে।
বিশীর্ণ হলে পরে নদীর লঘুজল চিত্তভরে তুমি করবে পান। ১৩

সামনেই শৈলের দিকেতে চোখ মেলে ভাববে চমকিত অঙ্গনারা ;
নিশ্চল বাতাসেতে তোমার হৃষ্টতা মুগ্ধ করে দেবে তাদের মন।
এইবার, এই স্থান, ছাড়িয়ে চলে যাও, আকাশে আরো দূরে, উত্তরেতে—
সাবধান সংঘাত সামনে হতে পারে বিরাট দিঙ্‌নাগ শুঁড়ের সাথে। ১৪

বল্মীক প্রভাবিত ইন্দ্রধনুকের আভায় নানা রঙ উঠল জেগে।
অভিরাম সুন্দর, তেমনি তব রূপ ফুটবে আকাশের বর্ণালীতে।
উজ্জ্বল মনোহর কান্তি শ্যাম তব প্রকাশ পাবে এই বিশ্ব জুড়ে।
প্রদীপ্ত শিখিদের বর্ণময়তায় বিষ্ণু যে-রকম গোপিনীপ্রিয়। ১৫

তোমাতেই নির্ভর কৃষির, বলে তাই সরল জনপদ গ্রামের বধূ
ভ্রূবিলাস বাদেতেই করবে আঁখিপাত মমতাময় মায়া দৃষ্টি তুলে।
উদ্দাম বর্ষণে, লাঙল পেয়ে পেয়ে, সুরভি মালভূমি, ধন্য হোক।
লঘুগতি কিঞ্চিৎ একটু পশ্চিমে যাও হে বাঁক নিয়ে উত্তরেতে। ১৬

স্নেহময় বর্ষণ নেবালো দাবদাহ তাপিত আম্রকূট শরীর থেকে।
ভ্রমণের যত শ্রম জুড়োবে মেঘ তব সাদর প্রাণভরা আলিঙ্গনে।
অতীতের উপকার স্মরণে যার আছে সুহৃদ যদি চায় শরণ তার ;
উদাসীন কখনোও থাকে না নীচুজন, কি আর কথা তবে মহৎদের। ১৭

পরিণত ফলভারে আমের উপবন কীর্ণ হয়ে আছে প্রান্ত জুড়ে ;
চিক্কণ বর্ণের বেণীর মতো হয়ে উঠলে তুমি সেই চূড়ার পরে।
দেবতার মিথুনের ভোগ্য বুঝি তাই হঠাৎ মনে হবে গর্ভবতী,
পৃথিবীর স্তনতট, কালিমা মাঝখানে প্রান্তে ছেয়ে আছে পাণ্ডুরতা। ১৮

অনুবাদ : অজয় দাশগুপ্ত

আধুনিক হিব্রু কবিতা

এক ॥ নামহীন যাত্রা। লেয়া গোলড্‌বের্গ (১৯১১-১৯৭০)

অপূর্ব এমন সব সপ্তাহ যখন আমায়
কেউ নাম ধরে ডাকে না এবং এ যেন বড়ো স্বাভাবিক
আমার রান্নাঘরের দাওয়ার টিয়েটাও
আমার নাম শেখেনি
আমার নামের স্বর নেই শব্দ নেই শ্রুতি নেই ;
দিনান্তর চলে যাই নামহীনতায়
নাম জানা পথ বেয়ে—
নামহীন বসে থাকি
নাম চেনা বৃক্ষের নিচে—
আর কখনো নাম ছাড়া তার কথা ভাবি
যার নাম নিজেই জানিনে।

দুই ॥ জেরুসালেমে লেখা প্রথম কবিতা। গ্যাব্রিয়েল প্রেইল (১৯১১—)

ইতিহাসের এই আকাশ মালার নিচে আমি
অ্যাব্রাহাম আর তাঁর নক্ষত্ররাজির চেয়ে প্রবীণ
আর আমি নবীনতম পিতা এই গোলাপী বৃক্ষ শোভায়
ক্রীড়াময় শিশুদের।

আল্‌হারিজি সড়কে এই বেগনি বিকেলে
ঐশ্বরিক মুহূর্ত গুলি খিলানরাজির বন্ধন ছাড়িয়ে
প্রসারিত প্রার্থনা পৌঁছোচ্ছে দেব-পুরুষের কাছে

আগুনের তাড়নায় আজ ক্লান্ত যিনি
স্বপ্ন রচেছিলেন
বিশদ নক্ষত্রের নিচে এক শান্ত জনপদের !

তিন ॥ নদীকে রুখতে চেয়েছিলাম। আমির গিল্‌বোয়া (১৯১৭—)

হাত দিয়ে আমি নদীকে রুখতে চেয়েছিলাম
চার ধারে জল ফুলে উঠে
খরস্রোতে বালুবেলা ডুবিয়ে
আমায় টান মেরে ভাসিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগলো—
আর যদি অই নগণ্য ঝোপ
প্রতি প্রত্যঙ্গে মাটির শপথ নিয়ে
দাঁড়িয়ে না থাকতো
তবে আমি বয়ে যেতাম
যে স্রোতে ভেসে গেছেন সব ভালো মানুষেরা।

চার ॥ বহুজনের ঈশ্বর কবিতা থেকে। আব্‌বা কোভ্‌নের (১৯১৮—)

ষাঁড়েরা লড়তে আসে না রঙ্গাভূমিতে
ও যে শোকবেদী। বর্ণ অন্ধ ওরা
চোখ দেখে বোঝা যায়।
ফেল্‌ না কাপড় যখন ওদের চোখে
ঝিলিক্‌ খেলায় সেই মুহূর্তে ওরা
মুক্তির ডাক শোনে, অন্ধতা ভাঙে আর ভাঙে অনড় অন্ধকারে
রঙ্গাভূমির দৃশ্য শহর মুছে যায়, জ্বলে আগুন
দাবানল হেন নিরুদ্ধ বধিরতায়
এক অন্তিম ছটায়
তখন রক্ত আমার রক্ত
শান্ত। সৌধ শীর্ষে

একটি ফেল্‌না কাপড়ের বিনিময়ে
তুলে ওঠে শত পতাকার সারি
হায় ঈশ্বর
আমার অন্ধ-দৃষ্টির বিনিময়ে।

[হিব্রু ভাষা ইজ্‌রেল রাষ্ট্র ইহুদি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। স্বভাবতঃই আধুনিক হিব্রু কবিতার দেশকাল ইতিহাসের নিবিড় ভাবে দেখতে পাই। অনূদিত কবিতার চারজন কবিই রুশ দেশে জাত।

শ্রীমতী লেয়া গোলড্‌বের্গ ১৯৩৫-এ প্যালেস্টাইনে চলে আসেন। ইজ্‌রেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তিনি হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল প্রেইল ১৯২২ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছেন। তিনি হিব্রু এবং ইদ্দীশ্‌ ভাষায় কবিতা লেখেন। এ ছাড়াও তিনি ইংরেজি কবিতার হিব্রু অনুবাদ করে থাকেন।

আমির গিলবোয়া ১৯৩৭ তে বৈধ অনুমতিপত্র ছাড়া পালিয়ে প্যালেস্টাইনে চলে আসেন। তিনি যৌথগ্রামে, খনিতে, সড়ক বিভাগে একদা শ্রমিকের কাজ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ব্রিটিশ দলের সেনা হিসেবে বিশ্ব ভ্রমণ করেন। বর্তমানে তেল-আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমির গিলবোয়া পোয়েট-ইন্‌ রেসিডেন্স।

আব্‌বা কোভ্‌নের ইহুদি হওয়ার দায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিপীড়ন ভোগ করেন। ১৯৭৬ এ তিনি প্যালেস্টাইনে চলে আসেন। তিনি বিবিধ সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন।

অনুসরণে: শোভন সোম

৭ পের্ল রোড, কেমব্রিজ, ইউ. কে.
১লা জুন, ১৯৭৬

জীবনানন্দ প্রসঙ্গে

সম্পাদক,
উত্তরসূরি সমীপেষু ;

২২শ বর্ষের ৩য়-৪র্থ যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত 'জীবনানন্দের কবিতায় শব্দ-ব্যবহার' প্রবন্ধটি মমতা দিয়ে পড়লাম। আপনি জীবনানন্দীয় শব্দব্যবহার প্রসঙ্গে যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার প্রতি কাব্যজিজ্ঞাসুর সক্রিয় দৃষ্টি নিশ্চয় পৌঁছবে। আপাতত এইটুকু বলি, ঐ বস্তু দুটি আপনি কবির চোখে দেখেছেন এবং পাঠকদের সামনে ও ভাবেই তুলে ধরেছেন বেশ পরিচ্ছন্নভাবে। আপনি ঠিকই ধরেছেন যে 'ছন্দের দিক থেকেও এই ('বনলতা সেন,) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি এক নূতন শৈলী স্থাপন করেছে।' (পৃঃ ১০৩) জীবনানন্দের সমগ্র কবিতাসম্ভারেই এই নূতন ছন্দ-শৈলীর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখি। রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দই সম্ভবত প্রথম, এবং একমাত্র, আধুনিক কবি যিনি শব্দচয়ন এবং শব্দসমুচ্চয়-সৃজনের মারফৎ এক নূতন কাব্যজগতের উদ্বোধন করেছেন। আপনি যে-উদ্ধৃতিগুলি দিয়েছেন, সেই জাতীয় বা তার কাছাকাছি যায় এমন শব্দ-সমুচ্চয় বা সমাবেশ হয়তো পূর্বেও কেউ কেউ ক'রে থাকবেন। কিন্তু ঐ প্রকারের শব্দ সমাবেশ রবীন্দ্র-বিশেষিত 'চিত্ররূপময়' বাক্‌প্রতিমার অন্তর্ভূত হ'য়ে পূর্বে কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। আসলে জীবনানন্দীয় শব্দব্যবহার যে প্রত্যক্ষত ইন্দ্রিয়সঞ্জাত এক প্রকারের 'চিত্ররূপকল্পনা'-ময় বাক্‌প্রতিমা-সৃজন কৌশলেরই অঙ্গ—এই দিকটার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আপনি সুবিচার ক'রেছেন।

আর একটু বলি। ভাষা ভাঙা মনে হয় কবির ধর্ম। অন্তত অল্পবিস্তর ভাঙাগড়া সব কবিই করেন। ভারতীয় ইংরেজি ভাষায় লিখিত কবিতা সম্পর্কে প্রায় দুদশক আগে বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন যে, যে-ভাষা বদলাবার দায়িত্ব নেওয়া যায় না সে-ভাষায় লেখার কোনো অর্থই হয় না। এর প্রতিধ্বনি শুনি প্রায় তেরো বৎসর পূর্বে বোম্বাই-এর এক কবিতাপাঠের আসরে মার্কিনি কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ, গ্যারি স্নাইভার এবং পিটার অর্লভস্কির ক্ষোভাভিভূত প্রতিক্রিয়ায়। ওখানে তিনজন ভারতীয় কবি তাঁদের ইংরেজিতে লেখা কবিতা পাঠ করছিলেন। আসলে ইংরেজি কাব্যভাষা ভাঙাগড়া নিয়ে ভারতীয় কবিরা ঝুঁকি নিতে পরাঙ্মুখ জেনে গীন্‌সবার্গ-প্রমুখ কবিগণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কাব্যভাষার ভঙ্গী নিয়ে সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সকল কবির কাছেই কাম্য। কিন্তু প্রচলিত ভাষাভঙ্গীর নিগড় ভেঙে সম্পূর্ণ নতুন বাকভঙ্গীসৃজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবিই করতে পারেন। উনিশ শতকের ঈশ্বরগুপ্তীয় বাক্‌জগৎ একেবারে ভেঙে দিলেন মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথ। বিশশতকের বাঙলা কাব্য-ভাষা এই দুই বঙ্গরথীর সৃষ্টি। এই শতকের তিরিশের দশকে বনলতা সেনের ভাষা যে আর এক সম্পূর্ণ নতুন বাক্‌ভঙ্গীর উদ্‌বোধন করেছে তার গুরুত্ব ঐ দশকে অনুভূত হয় নি। পরের দশক থেকে বাঙালি কবিগণ যে অন্তত এর মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ তাঁদের রচনাতেই আছে। জীবনানন্দীয় বাক্‌ভঙ্গীবৈশিষ্ট্যটির আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্দর্শন হওয়া উচিৎ।

জীবনানন্দীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প'ড়ে আমার কোনো কোনো বন্ধু মন্তব্য করেছেন যে 'কবি নিঃসংকোচে প্রকৃতির কবি।' আশ্চর্য যে বাঙালি পাঠকদের কাছে জীবনানন্দ যে প্রকৃতির কবি, অর্থাৎ মুখ্যত প্রকৃতির কবি, একথা মোটেই মনে হয় না। যতীন্দ্র মোহন স্বভাবকবি, সত্যেন্দ্রনাথ হয়তো প্রকৃতির কবি, কিন্তু জীবনানন্দ নিশ্চিতই অন্য প্রকৃতির কবি। আটপৌরে গদ্যবাক্‌ভঙ্গীকে জীবনানন্দ এমনই স্বচ্ছন্দভাবে কাব্যিক ক'রে ব্যবহার ক'রেছেন যে এঁর ভাষা

মুখ্যত বিদগ্ধ বৈঠকগৃহের একটু আবেগাপ্লুত কথনজাল ব'লে ভ্রম হয়। এঁর কাব্যজগতে প্রকৃতি নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলভাবেই স্থাপিত রয়েছে। কিন্তু আটপৌরে কথনজালে বাঁধানো যে-জগৎটিকে আমরা অন্তত অনুভব করবার চেষ্টা করি তা একটু অতিপ্রাকৃত তো ঠেকেই। মনে হয়, একটু অতীন্দ্রিয় আবহ সৃজনও কবির অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু আশ্চর্য এই লক্ষ্যসাধনটি সিদ্ধ হয়েছে অত্যন্ত অন-অতীন্দ্রিয় বাক্‌-বিস্তারের সাহায্যে। জীবনানন্দের কবিতার ইংরেজি রূপান্তরে ঠিক এই ধরণের বাক্‌বিস্তারের বৈশিষ্ট্যটিকে ধ'রে রাখা অন্তত আমার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছে। আমার কোনো কোনো বন্ধু যে অনুবাদকের রূপান্তর প'ড়ে ঐ মন্তব্য করেছেন তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে জীবনানন্দ যে-ভাবে শব্দব্যবহার ঘটিয়েছেন তাঁর কাব্যে তার কারু-কৌশলটি খুব সহজ নয়।

এইবার পাড়ি প্রথম প্রসঙ্গটি, ছন্দ সম্পর্কে। জীবনানন্দ বেশির ভাগ কবিতাই লিখেছেন যাকে প্রবোধচন্দ্রীয় পরিভাষায় বলা যায় 'মিশ্রকলাবৃত্তে।' এই ছন্দোরীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে আটপৌরে কথাবলার বাক্‌ভঙ্গীকে সহজেই কাব্যিক বাক্‌ভঙ্গীতে রূপান্তরিত করা যায়। শিষ্ট কথোপকথনে আমরা যে-রীতিতে বাক্য-মালা উচ্চারণ ক'রে থাকি, সেই উচ্চারণ রীতিপ্রকৃতির উপর ভিত্তি ক'রেই এই ছন্দ-সৃজন সম্ভব হয়—স্বাভাবিক উচ্চারণপ্রথার আমূল পরিবর্তন করবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় না এই ছন্দো-রীতিতে। ফলে এই ছন্দে ব্যবহৃত দেশীবিদেশী বিদগ্ধ প্রাকৃত সবরকমের শব্দ-সমাবেশে বাঙলা ধ্বনিপ্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্মটাই প্রাধান্য পায়। সুদীর্ঘ কাব্যবাক্য-ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত কবি জীবনানন্দ, মনে হয়, তাঁর স্বভাবগুণেই এই প্রকৃতির ছন্দের আশ্রয় নিয়েছেন। সুদীর্ঘ ছন্দ-পংক্তিতেও, তাঁর অনেক কবিতাতেই, তাঁর বাক্যসীমা সমাপ্ত হয় নি। মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত দীর্ঘ পংক্তি-গাঁথা স্তবকবন্ধেও তিনি গদ্যের ন্যায় নানা আকারে পর্ব ও পদ-সমাবেশ ঘটিয়েছেন। প্রচলিত পয়ারে দুটি পদের এবং ত্রিপদীতে তিনটি পদের সুনির্দিষ্ট গড়নের একটা বিন্যাস

দেখি, এই বিন্যাস সম্ভব হয় ঐ বিশিষ্ট আয়তনের পদসমাবেশ দ্বারা আর ঐ বিশেষ ক্রমে সাজানো নির্দিষ্ট আয়তনের পদগুলির শেষে যতিপাতনজনিত এক প্রকারের ধ্বনি-আবর্তন সৃষ্টি হয়—এই প্রকারের পদাবর্তনই মিশ্রকলারীতির দ্বিপদীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জীবনানন্দের বেশির ভাগ কবিতাতে দেখবো এই প্রকারের বিশিষ্ট-আয়তনের পদ-রাজির ক্রমনির্দিষ্ট আবর্তন সাধিত হচ্ছে না। বিভিন্ন পংক্তিতে বিভিন্ন আয়তন-বিশিষ্ট পদের বিভিন্ন ক্রমে আবর্তন হচ্ছে—ফলে সুমিত যতি-স্থাপনজনিত যে ধ্বনিতরঙ্গাঘাতে ছন্দোবদ্ধ কবিতায় আশা করা যায় তার অনুপস্থিতি দেখি জীবনানন্দের কবিতায়।

একটু তথ্য দিয়ে বক্তব্যটিকে পরিষ্কার করি।

একটি পরিচিত কবিতা নেওয়া যাক। 'মৃত্যুর আগে'। এতে ৪৮টি পংক্তি আছে—ছয় পংক্তির আটটি স্তবক। স্তবকের শেষে কোথাও পূর্ণচ্ছেদ নেই, অর্থাৎ সমগ্র কবিতাটি একটি অতিকায় বাক্য যেন। পংক্তিগুলির আয়তন ২২ মাত্রার, কেবল তিন ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে—ষষ্ঠ ও অষ্টম স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে ও সপ্তম স্তবকের শেষ পংক্তিতে পাই ২৬ মাত্রা। আপাতদৃষ্টে মনে হবে এটি ত্রিপদী প্রবহমান মিশ্রকলাবৃত্তের—৮।৮।৬ এবং ৮।৮।১০-এর পদসমাবেশ সাধিত পংক্তিবন্ধে রচিত। কবিতার তৃতীয় স্তবকটি পুরো তুলে দিই :

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্রনীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মত আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ—
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

এর প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম, শেষ—এই চার পংক্তিতে সহজেই দুটি আটমাত্রার ও একটি ছয়মাত্রার পদ পাই ৮।৮।৬-এর ক্রম-এ। কিন্তু গোল বাধায় তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিদুটি। ওখানে ৮।৮।৬-এর ক্রম কিছুতেই পাওয়া যায় না। পদ ভাগ করলে ৮।৪।১০-এর ক্রম মেলে

ক্ষেত্রেই। চারের আয়তনকে পদ হিসেবে না মানলে একে জুড়ে দিতে হয় পূর্বের পদের সঙ্গে—আট-চার মিলে বারোমাত্রার এক মহাকায় পদ মেলে পংক্তির আদ্যংশে। বারো-দশ-এর দুটি পদ মানলে অন্তত এই পংক্তিদুটিকে ঐ স্তবকের বাকি পয়ার বলতে হয়। আশ্চর্য এই যে বারো-দশের ভাগ মানলে এভাবে পড়লে অন্তত প্রতিটি পংক্তিতে নির্দিষ্ট আয়তনযুক্ত পদভাগের এই বিশিষ্ট ক্রমটি (১২॥১০) পাই।

অন্য সাতটি স্তবকের পংক্তিগুলির পদসমাবেশ কিন্তু অন্য প্রকৃতির। এমন পংক্তি গুণতিতে পাই ১৪টি যেগুলিকে ৮॥৮॥৬-এ পড়তেই হবে। ৪॥৮॥১০-এর ভাগে পড়তেই হবে এমন পংক্তির সংখ্যা ৫টি। ৮॥৮॥১০-এর পংক্তি ৩টি, ৮॥৪॥১০-এর আরও একটি পংক্তি (পঞ্চম স্তবক. ৪র্থ পংক্তি), ১২॥১০-এর আরও ১৬টি এবং ১২॥১০-এ পড়া গেলেও তা অবাঞ্ছিত বলবো এমন পংক্তি পাই ৩টি। ৮॥৮॥৬-এর যে-১৪টি পংক্তির কথা উল্লেখ করেছি এগুলির ৭টিতে দ্বিতীয় পদ হলো ৩।৩।২-মাত্রার শব্দসমাবেশে গঠিত—অর্থাৎ এ পংক্তিগুলি অকৃত্রিমভাবে ত্রিপদী, প্রথম আটমাত্রার পর অর্ধযতি ফেলতেই হবে এগুলিতে; বাকি ৭টি পংক্তি প্রবহমানতার জন্যে পূর্তিযতি, এক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদের পর পূর্তিযতি (অর্থাৎ পংক্তির হিসেবে এখানে ১৬ মাত্রার পর ভাব-বা পূর্তিযতি)।

ছন্দোরীতির দিক দিয়ে দেখলে কবিতাটি মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত, গঠনের দিক দিয়ে ত্রিপদী হিসেবে দেখলে এর চার, ছয়, আট ও দশমাত্রার—এই চার প্রকারের পদায়তন চোখে পড়বে। এই চার প্রকারের পদের সমাবেশ-তারতম্যে যে-চার জাতীয় পংক্তি পাই তার পরিচয় দিই—

ক	৮॥৮॥৬-এর	৩৭টি পংক্তি
খ	৮॥৮॥১০-এর	৩টি পংক্তি
গ	৮॥৪॥১০-এর	৩টি পংক্তি
ঘ	৪॥৮॥১০-এর	৫টি পংক্তি

তাহলে ত্রিপদী হিসেবে দেখলে ত্রিপদীর চিরাচরিত ক্রমনির্দিষ্ট বিন্যাস [৮॥৮॥৬ (অথবা ১০)-এর] অপেক্ষিত, তা অন্তত আট জায়গায় ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে আলোচ্য পদ্যটিতে ('গ' ও 'ঘ'-এর পংক্তিগুলিতে)।

পংক্তিগুলিকে দ্বিপদী হিসেবে দেখা যায়? ৮॥৪॥১০ এবং ৪॥৮॥১০ এর পদভাগকে যে ১২॥১০-এর সমাবেশরূপে ব্যাখ্যা করা যায় তার উল্লেখ আগেই করেছি। কবির যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে পংক্তিগুলিতে অর্ধযতি থাকবে একটি করে, তাহলে সমগ্র কবিতার ৪৮টি পংক্তির মধ্যে ২৮টিতে যে ১২॥১০-এর ভাগ বেশ স্বচ্ছন্দভাবে স্থাপিত তা ছন্দ-জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি এড়াবে না। অর্থাৎ কবিতার অর্ধেকেরও অংশ দ্বিপদী। বাকি ২০টি পংক্তির ১৭টিতে দুটি অর্ধযতি নিঃসন্দেহে পড়েছে—অর্থাৎ এগুলি ত্রিপদী বাকি ৩টিতে ধ্বনিগতভাবে একটিমাত্র অর্ধযতি স্থাপনা করা গেলেও বাক্‌ভঙ্গীর শৃঙ্খলা মানলে দুটি অর্ধযতি স্থাপন করতেই হবে। এই প্রকারের পংক্তির এক উদাহরণ দিই—

আমরা দেখেছি যারা সুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ

'আমরা দেখেছি যারা সুপুরির'-এর পর যতিপাতন ঘটালে পংক্তিধৃত বাক্‌ভঙ্গীর শৃংখলা নষ্ট হয়। মিশ্রকলাবৃত্তের বৈশিষ্ট্যই হলো গদ্যের মতো বাক্‌ভঙ্গী-অনুসারী যতিপাতন। কাজেই দেখা যাচ্ছে অন্তত কুড়িটি পংক্তিতে দুটি অর্ধযতি স্থাপনা কবির উদ্দেশ্য। তাহলে কি বলবো যে এই কবিতার ছন্দোবন্ধটি মিশ্রপ্রকৃতির? দ্বিপদী ও ত্রিপদীর সমন্বয়ে গঠিত?

তাও নয়। কেন নয়, বলি। এখানে নির্দিষ্ট গঠনের দ্বিপদী ও ত্রিপদীর কোনো বিশিষ্ট ক্রম সৃষ্টি করার দিকে কবির লক্ষ্য যায় নি। সচেতনভাবে কবি কোনো পংক্তি দ্বিপদী ও কোনো পংক্তি ত্রিপদীরূপে রচনা করেননি, বা এদুই রূপের সমন্বয়ে কোনো স্তবকবন্ধও সৃষ্টি করার দিকে উদ্‌যোগী হন নি। কবির সব দৃষ্টি গিয়েছে পংক্তির সামগ্রিক চেহারাটাকে অটুট রাখতে। যেহেতু তিনি ২২ মাত্রার দীর্ঘ পংক্তিবন্ধ বেছে নিয়েছেন এক্ষেত্রে, তাই পংক্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে পদবন্ধে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পদাকৃতির কোনো বিশিষ্টরূপের

আবর্তন ঘটাবার প্রয়াস পান নি কবি, বরং ওইরকম বিভিন্ন আকৃতির পদের বিভিন্নভাবে সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই বিচিত্রাকার পদ সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই বিচিত্রাকার পদ-সমাবেশ সাধিত পংক্তিগুলিকে কি তাহলে বিচিত্রপদী বা চিত্রপদী পংক্তি বলা যাবে?

তাও নয়। আমার মনে হয়—পদের ভাগটাই কবির কাছে গুরুত্ব পায় নি। পংক্তির মাপটাকেই উনি প্রাথমিক ব্যক্তিরূপে দেখেছেন। প্রচলিত আটমাত্রার পয়ার পদ যেমন ৪।৪ বা ৩।৩।২ মাত্রাবিশিষ্ট শব্দসমাবেশের ফল, বা ছয়মাত্রার পয়ারপদ ৪।২ বা ২।৪ বা ৩।৩ মাত্রাবিশিষ্ট শব্দসমাবেশে সাধিত, জীবনানন্দীয় মিশ্রকলাবৃত্ত পংক্তিগুলিও তেমন চার, ছয়, আট, দশ বা বারোমাত্রার পদের ৮॥৮॥৬, ১২॥১০ ইত্যাদির। সাধারণ পয়ারে ত্রিপদীতে যেমন হয়, এর অবয়বস্থ উপযতি বা অনুযতি স্থাপনার দিকে ততোটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি আলোচ্য কবিতাচ্ছন্দে দেখি সামগ্রিক পংক্তির আয়তনমাপ রক্ষার দিকেই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ। পংক্তি অবয়বস্থ পদ-যতি ও পর্বযতি স্থাপনার কোন নির্দিষ্ট নীতি স্বীকৃত হচ্ছে না। আলোচ্য পদ্য-ছন্দে বিশেষ মাপের কলায়তনান্তরে যতিস্থাপন বলে যদি কিছু থাকে তার অস্তিত্ব উপলব্ধ হবে এই পংক্তিব্যাষ্টির মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কলায়তনান্তরে যে-পংক্তি যতিটি স্থাপিত হচ্ছে তার দ্বারাই ছন্দসৌন্দর্য রক্ষিত আছে।

ছন্দপ্রকৃতি হিসেবে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি মিশ্রকলাবৃত্তের, কিন্তু ছন্দ-আকৃতি হিসেবে এটি তাই মিশ্রবন্ধের নয়। এর ছন্দোবন্ধ বিশেষ একপ্রকারের পংক্তিবন্ধ, যেখানে নির্দিষ্ট মাপের পদভাগজনিত সুমিত যতিভঙ্গ সৃজনের কোনো প্রযত্ন নেই। ছন্দোবন্ধের পরিচয় সাধারণত পদ-নামাঙ্কিত হয়—যেমন একপদী, দ্বিপদী ইত্যাদি। এই ঐতিহ্য রাখতে গেলে একে বলতে হয় 'নিষ্পদী পংক্তিবন্ধ' বা 'নিষ্পদী পয়ার'।

আপনি যে মন্তব্য করেছেন জীবনানন্দের কবিতা, ছন্দের দিক দিয়ে এক নূতন শৈলী স্থাপন করেছে—তার ভিত্তি মনে হয় এই 'নিষ্পদী পয়ারে'।

আমার প্রীতি-নমস্কার জানুন। ইতি পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী